মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

Ben

KHAIRUN PROKASHANI
খায়রুন প্রকাশনী

খায়রুন প্রকাশনী
KHAIRUN PROKASHANI

Iqbaler Rajnoitik Chinta Dhara

اقبالیر راجنویتک چنتا دهارا

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
45324
LAHORE

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

প্রধান কার্যালয় ঃ ১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার,ঢাকা-১২১৭

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০ ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২,

মোবাইল ঃ ০১৭ ৯০৭৭৮৫

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশ কাল

প্রথম ঃ ১৯৬০ ॥

দ্বিতীয় ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৩, অগ্রহায়ণ ১৩৯০, সফর ১৪০৪॥

তৃতীয় ঃ জুন ২০০২, আষাঢ় ১৪০৯, রবিউল সানি ১৪২৩ ॥

প্রকাশক

মোস্তাফা জহিরুল হক

খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ শিল্পী

আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস

মোস্তাফা কম্পিউটার্স (ওয়ালী উল্যাহ ভুইয়া)

১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ

আফতাব আর্ট প্রেস, ২/৩ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৫০ টাকা

পূর্ব কথা

মহাকবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল বিংশ শতাব্দীর এক অসামান্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। তিনি গতানুগতিক ধারার কোন কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন জীবনবাদী ও আদর্শ-প্রেমিক এক কবি-ব্যক্তিত্ব। তাই কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় তিনি 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। শুধুমাত্র নান্দনিক পিপাসা চরিতার্থ করার জন্যেও তিনি সাহিত্য চর্চা করেননি। তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। এজন্যে মৌল প্রেরণা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন পৃথিবীর মহত্তম আদর্শ ইসলামকে। তাঁর কাছে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মমতই ছিলনা, বরং ইসলামের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে একটি পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। ইসলামের মাধ্যমেই তিনি ফিরে পেতে চেয়েছেন মুসলমানদের হারানো গৌরব ও মর্যাদা।

ইকবাল ছিলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এক কালজয়ী চিন্তানায়ক। পশ্চিমী সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভক্তি থেকে উদ্ভূত পশ্চিমী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বীভৎস চেহারা দেখে তিনি বারবার শিউরে উঠেছেন এবং এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে মানব জাতিকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কুফরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেনঃ 'রাষ্ট্র থেকে যদি ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সেখানে চেঙ্গিজী (স্বৈরাচার) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা'। পশ্চিমের গণতন্ত্র সম্পর্কে ইকবালের মূল্যায়ন হচ্ছে ঃ এটি এমন এক শাসন প্রনালী, যেখানে মানুষের মাথাই শুধু গণনা করা হয়, তার মস্তিষ্ককে ওজন করা হয় না। তিনি পশ্চিমের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকেও অত্যন্ত নির্মম ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

ইকবাল ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁ (নবজাগরণ)-এর এক মহান স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি মুসলিম উম্মাহকে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তারা

আবার দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে, এ স্বপ্ন তিনি আজীবন লালন করেছেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলিম গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্যেও প্রবলভাবে তাগিদ দিয়েছেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের গৃহীত 'লাহোর প্রস্তাবে' তাঁর রাষ্ট্র-চিন্তার প্রতিফলন ঘটলেও তাঁর বক্তব্যের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটি স্থানলাভ করেনি। এমন কি, ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রেও তাঁর চিন্তাদর্শের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি, যদিও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'জাতীয় কবি' রূপেই বরণ করে এসেছেন।

আসলে ইকবাল ছিলেন এক কালোত্তীর্ণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে এক চিরন্তন দিক-নির্দেশনা। ইসলামী উম্মাহ্র অংশ হিসেবে তাঁর চিন্তাদর্শকে জানা ও বোঝা দরকার আমাদের নিজস্ব গরজেই। প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ) বিরচিত 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা' আমাদের জন্যে এ কাজটিকেই সহজ করে দিয়েছে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে। গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় কলকাতাস্থ্ মাসিক 'মোহাম্মদী'তে। তখনই এটি বিদগ্ধ পাঠক মহলে বেশ সমাদর লাভ করে। এরপর করাচীস্থ্ ইকবাল একাডেমী ও পরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে দু'বার এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বিলম্বে হলেও 'খায়রুন প্রকাশনী' গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে সময়ের একটি বিরাট চাহিদা পূরণ করেছে। এজন্যে তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
ঢাকা ঃ ২৫ মে, ২০০২ চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম (রহ) ফাউণ্ডেশন

মুখবন্ধ

আল্লামা ইকবাল বর্তমান শতকে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক বলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুধীমণ্ডলীর কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জীবন দর্শনের কবি ইকবালের অমূল্য চিন্তাধারা কেবল প্রাচ্য দেশসমূহের নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানের চিন্তার রাজ্যে এক বিপ্লবাত্মক ও কল্যাণ অভিসারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিগত কয়েক শতকের পতনমুখী গতিপথে চালিত মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়-গতিহীন জীবনে এনেছে অপূর্ব কর্মোন্মাদনা ও গতিচাঞ্চল্য।

ইকবালের চিন্তাধারার বুনিয়াদ প্রধানত ইসলামের উপর। ১৯৩০ সালে ২৯ শে ডিসেম্বর নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ইকবাল বলেছিলেন ঃ 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়নে—ইসলামের কানুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার তমদ্দুন, তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে। আমার মনে হয়, ইসলামের প্রাণবস্তুর সাথে এই অবিরাম সংযোগের ফলে তা আমার উপলব্ধিতে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসাবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টির অধিকার লাভ করেছি।'

ইকবালের কাছে ইসলাম প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নিছক ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি নয়; বরং এক পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ জীবন-বিধনা। মানব জীবনের কোনো বিশেষ দিকই ইসলামের আওতার বাইরে পড়ে না; তাই রাজনৈতিক দর্শনকেও তিনি এই জীবন দর্শনেরই এক অপরিহার্য অংশ মনে করতেন। এই সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় সমভাবে রাজনীতির দিকেও মনোযোগী হয়েছিলেন। ইকবালের মতে 'রাজনীতির মূল রয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের গভীরে' এবং ধর্মকে তিনি মনে করতেন 'ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলে। আধুনিক দুনিয়ার অধিকাংশ চিন্তাবিদ যখন ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করবার স্বপক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে এসেছেন, ইকবাল তখন অকুতোভয়ে ঘোষণা করেছেন ঃ 'ইসলাম মানুষের একত্বকে আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়াতীত দ্বৈতবাদে বিভক্ত করে না। ইসলামে আল্লাহ ও বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা ও বস্তু, উপাসনাগার ও রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক।'।

সমসাময়িক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহের প্রতি কবি-দার্শনিক ইকবালের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তখনকার

দিনের পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক আদর্শসমূহের প্রভাবে ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতির প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা দেখেই কবি রাজনীতির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন।

কুরআন মজীদের শিক্ষার আলোকে কবি জাতির পথ-নির্দেশ করে বলেছেন ঃ 'সুনির্দিষ্ট আদর্শের আলোকে যতক্ষণ না কোন জাতি তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রদীপ্ত করে তুলে তাদের নিজস্ব অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করার জন্যে উদ্যমশীল হয়, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না। ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক জীবনের আযাদীর উপর সুদৃঢ় ঈমান ব্যতীত কোন কিছুই অর্জন করা যায় না। একমাত্র এই ঈমানই জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার লক্ষ্যের প্রতি এবং তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রাখে চিরন্তন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে।

ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে রাষ্ট্র রূপায়নের জন্যে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি-দার্শনিক ইকবালের জীবন দর্শনই তাই পাকিস্তানী জনগণের অনুসরণীয় জীবনাদর্শ। তাই তাঁর চিন্তাধারার সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় লাভের অপরিহার্য গুরুত্ব রয়েছে আমাদের জীবনে।

পাকিস্তানের উভয় অংশ ইকবালের কাব্য ও দর্শনের যে ব্যাপক আলোচনা চলেছে ও চলছে, তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। পূর্ব পাকিস্তানে এ যাবত যে স্বল্প সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়ে বাংলাভাষী পাঠকদেরকে ইকবালের চিন্তাধারার সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ দিয়েছে, তার মধ্যে কোন পুস্তকে ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ধারাবাহিক আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বর্তমান পুস্তক পরিবেশন করে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম আমাদের একটি বিরাট অভাব পূরণ করেছেন। তাঁর এ বইখানি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

লেখক নিজে চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং ধর্মীয় শিক্ষায় সমৃদ্ধ। তিনি বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ। বর্তমান পুস্তক তাঁর গভীর গবেষণা ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফল। তাঁর সাধণা বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে, এই আমার বিশ্বাস। ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান বইখানি প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে গুণের আদর করেছেন বললে অসংগত হবে না।

সৈয়দ আবদুল মান্নান
২৩, আরামবাগম,-ঢাকা-২
৫ জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সাহিত্য সমালোচকদের মতে প্রত্যেকটি 'যুগ'ই তাহার নিজস্ব ভাবধারা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কবি ও সাহিত্যিক সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক সার্থক কবিই হন সমসাময়িক যুগের প্রকৃত অবস্থার বাস্তব প্রতীক। কাব্য ও কবিত্বের ইতিহাস এবং বিশ্বজাতি সমূহের বিভিন্ন সময়ের অবস্থা বলিষ্ঠভাবে এই সত্যই প্রমাণ করে। বস্তুত যখন কোন জাতির মধ্যে বীরত্ব ও যৌবনদীপ্ত সাহসিকতা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান থাকে, ব্যক্তিগণ যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ক্ষেত্রকে মনে করে আনন্দস্ফূর্তির লীলাকেন্দ্র, নগ্ন তরবারি যখন ঈদের চাঁদের মাধুর্য বহন করিয়া আনে, তখন সেই জাতির কবি স্বভাবতই যুদ্ধের উদাত্ত বাণী রচনা করেন। নরহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তাণ্ডবনৃত্য তখন কবির কাব্যে মহান শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। তাঁহার কাব্যের প্রতিটি ছত্র উন্মুক্ত কৃপাণের ন্যায় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার হয়। তাঁহার অনলবর্ষী বাণী ঝংকারে অনুরণিত হইয়া উঠে বীরত্বের অপূর্ব ধ্বনি। এই বাণীই বিভিন্ন জাতি ও দেশকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে। এই ধরনের কবির আবির্ভাব ঘটে সাধারণত অন্ধকার যুগের এক ততোধিক তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ে।

জাতীয় জীবনে আর একটি সময় আসে, যখন জাতি হয় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের মালিক, কিন্তু জীবন-যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম স্তিমিত-স্তব্ধ হইয়া যাওয়ার কারণে দেখা দেয় সর্বগ্রাসী অবসাদ ও নির্বীর্যতা; আর কবি হন তখন বিলাসী ধনিকদের দরবার শোভা; কাব্যজগতে তখন সঙ্গীত ও স্তুতিমূলক কবিতার প্রাধান্য দেখা দেয়। তখন বস্তুতই কাব্য প্রতিভার এক অবাঞ্ছিত অদঃপতন সূচিত হয়। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি হয় চূড়ান্তভাবে ব্যাহত।

ইহার পরই জাতীয় জীবনে দেখা দেয় তৃতীয় ধরনের এক অধ্যায়। তখন জাতির অবস্থা সর্বতোভাবে মর্মান্তিক হইয়া পড়ে। নিজের পতন, দুর্গতি ও চরমতম দুরবস্থা সম্পর্কে জাতির সত্তায় একবিন্দু চেতনাও অবশিষ্ট থাকে না। পদাঘাত, নির্যাতন-নিষ্পেষণ নির্বিকার চিত্তে ভোগ করাই হয় তখন তাহার একমাত্র কাজ। ঠিক এই মুহূর্তে—জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণেই এমন এক প্রতিভাশালী কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে যাঁহার বাণীর তীব্র শাণিত কশাঘাতে অবলুপ্ত চেতনাশক্তি জাগ্রত হয়,

হিম-শীতল স্থবির কর্মক্ষমতা কবির আবেগপূর্ণ ও জ্বালাময়ী কবিতার অগ্নিস্ফূলিঙ্গ স্পর্শে বিদ্যুতের ন্যায় সক্রিয় হইয়া উঠে। মিল্লাতের মৃত ধমনীতে—নবজীবনের তপ্তশোণিত ধারা উদ্দাম স্রোতে প্রবাহিত হইতে শুরু করে। কবি তখন জাতিকে শাশ্বত কল্যাণের দিকে পথ-নির্দেশ করেন। তিনিই হন জাতীয় সমস্যার ব্যাখ্যাতা, অন্ধকার সমাচ্ছন্ন পথের দিশারী।

কাব্য জীবনের সূচনায়

ইকবাল যখন লাহোরের সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত, ঠিক তখন হইতেই তাঁহার বিরাট কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ হইতে শুরু হয়। তাঁহার কাব্যখ্যাতি প্রথম দিক দিয়া কেবল মাত্র সহপাঠীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বন্ধু-বান্ধবগণই তাঁহার ফুটনোন্মুখ কাব্যকুসুমের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করে। তখন তিনি তাঁহার কাব্যসুরভি বিস্তারে তাহাদিগকে মুগ্ধ-বিমোহিত করিয়াছিলেন।

এই সময় লাহোরে যেসব 'মুশায়েরা'র অনুষ্ঠান হইত ইকবাল তাহাতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। তাঁহার কবিজীবনের ওস্তাদ ছিলেন মীর্জা দাগ দেহ্‌লভী। ইকবাল কাব্যের উৎকর্ষ লাভে তাঁহার সংশোধন ও মূল্যবান পরামর্শ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

প্রথমদিকে ইকবাল গজল ও গীতি কবিতাই রচনা করিতেন বেশীর ভাগ। সর্ব প্রথম এক মুশায়েরায় তিনি যে গজল পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্ন লিখিত পাদটি তন্মধ্যে সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল ঃ

اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے غرض
ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے

লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর প্রতি
ইকবালের নাই কোন আকর্ষণ;
পূর্ণত্ব লাভের জটিল সাধনায়
আমরা রয়েছি বন্দী।

ইকবাল প্রথম দিনই দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর বিশেষ আভিজাত্য ও ভাবধারার সংকীর্ণ গণ্ডীর বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণ এক নিজস্ব কাব্যজগত ও উদার অকুণ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন।

বস্তুত যেসব কবির আবির্ভাব হয় অধঃপতিত দেশ ও ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত, উন্নত ও নতুন কর্মোন্মাদনায় অনুপ্রাণিত করার সংগ্রাম-সাধনার জন্য, তাঁহারা গজল ও নিছক প্রেম-ভারাতুর গীতি কবিতার কল্পলোকে বেশীদিন সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না। তাই ইকবালকেও শেষ পর্যন্ত নিজ অধঃপতিত জাতির একেবারে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইল। ১৮৯৯ ঈসায়ীতে তিনি 'নালায়ে ইয়াতীম'— 'ইয়াতীমের আর্তনাদ' শীর্ষক যে কবিতা অন্তরঢালা দরদ দিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কাব্য প্রতিভা ও গভীর পাণ্ডিত্য সুষমা সমগ্র ভারতের বিদগ্ধ সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দেশপ্রেমিক কবি

অতঃপর ইকবাল জাতি ও দেশকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে শুরু করিলেন। জাতির অধঃপতিত মর্মান্তিক চিত্র দর্শনে তাঁহার অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতিকে এই অধঃপতন ও অসহায় অবস্থা হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একদিকে তিনি তাঁহার চিত্তহারী সুরঝংকারে রক্ত-অশ্রু প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। অপরদিকে তাঁহার বুকের রক্ত নিংড়ানো কবিতামালায় ভরিয়া দিতে লাগিলেন 'মাখজান' নামক মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা। এই সময় তিনি 'হিন্দুস্তান হামারা' (ভারত মোদের), 'হিমালিয়া' ও 'নয়া শিওয়ালা' শীর্ষক যে কবিতাগুলি প্রকাশ করেন, তাহা ভারতের জ্ঞানদীপ্ত সুধী সমাজকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

কিন্তু ইকবাল খুব বেশি দিন স্বদেশবাদী কবি হইয়া থাকেন নাই। ১৯১০-১১ সনের ইতিহাস বিশ্ব মুসলিমের জন্যে এক নবতর কারবালার সৃষ্টি করে। বলকান ও ত্রিপলির যুদ্ধে মুসলমানদের বিপুলভাবে রক্তক্ষয় হইতেছিল, ইসলামী খিলাফতের নির্বানোন্মুখ প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হইবার এবং ইসলামের রাষ্ট্রক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই অবস্থায় মুসলমানদের জাতীয় কবি দার্শনিকের হৃদয়-সমুদ্রে প্রবল ঝড়ের তাণ্ডব সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁহার কাব্যের উদ্দাম প্রবাহে মুসলিম-বিশ্বের মানস সরোবরে অপূর্ব আলোড়নের সূত্রপাত হইয়াছিল। তখন জনগণ তাঁহার কাব্য-গাথা শ্রবণ করিয়া বুকফাটা কান্নায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে, বাঁধভাঙা অশ্রু-বন্যায় দুই চোখ ভাসাইয়াছে। বিশেষতঃ ১৯১১ সনের ৬ই অক্টোবর তিনি লাহোরের শাহী মসজিদে 'খুনে শহীদা কি নযর'— শহীদদের রক্তের নামে— শীর্ষক যে কিবতা পাঠ

করিয়া শোনাইয়াছিলেন তাহা সভাস্থলে কিয়ামত সৃষ্টি করিয়াছিল। উহা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের চক্ষুকোটর হইতে রক্ত-অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল এবং তাহাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ইসলামী আদর্শবাদী কবি ইকবাল

এই সময় গোটা মুসলিম মিল্লাত ইসলাম ও মুসলিম দেশসমূহের উপর ঘনায়মান বিপদ ঝঞ্ঝায় মূহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। আল্লামা ইকবালের অবস্থা ইহা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। বিশেষত কবি-দার্শনিকদের তীব্র আবেগ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ইকবাল এই বিশ্বগ্রাসী বিপদকে অনুভব করিয়াছেন অত্যন্ত তীব্রভাবে ও অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে। তিনি মনে করিলেন 'ওয়াতন' (স্বদেশ) যেন মানুষের উপাস্য দেবতার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে অথচ বিশ্বব্যাপী মিল্লাতের নক্ষত্রপুঞ্জের সাথে ব্যক্তিসত্তার মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই ইকবাল 'তারানায়ে হিন্দীর' পরিবর্তে লিখিলেন 'তারানায়ে মিল্লী', স্বদেশপূজা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন ইসলামী মিল্লাতের বিজয়গাথা রচনায়, যে ইকবাল একদা লিখিয়াছিলেন ঃ

سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا

ভারত আমাদের সর্বোত্তম দেশ
সমগ্র বিশ্বের মাঝে,
আমরা যেন বুলবুল,
আর এই দেশ আমাদের গুলবাগিচা।

সেই ইকবাল ইসলামী জাতিয়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া লিখিলেন ঃ

چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا
مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا

চীন আমাদের আরব মোদের;
ভারতবর্ষও আমাদেরই দেশ;
আমরা মুসলমান
তাই সমগ্র বিশ্বই হচ্ছে আমাদের স্বদেশ।

অর্থাৎ স্বাদেশিকতার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে নিষ্ক্রান্ত ইকবাল পদক্ষেপ করিলেন আন্তর্জাতিকতার উদার উন্মুক্ত পরিবেশে; আদর্শবাদিতার বিশাল প্রান্তরে। অতঃপর তাঁহার কাব্য ইসলামী ভাবধারা, উচ্চাংগের চিন্তা ও তথ্য সম্পদে ভরপুর হইতে লাগিল এবং সামগ্রিকভাবে তাহা ইসলামী রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তাঁহার কাব্যাদর্শের এই লক্ষ্য নির্ধারণ এবং আদর্শ ও ভাবধারার দিক দিয়া এইভাবে মোড় ঘুরিয়া যাওয়া স্বাদেশিকতা পন্থিগণ তাঁহার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু আদর্শবাদী ইকবাল তাহার বিন্দুমাত্র পরোয়া করিলেন না। তাই তাঁহার জ্বালাময়ী কাব্যগাথা গোটা মুসলিম জাহানে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বস্তুত ইকবালের বক্ষপিঞ্জরে একই সঙ্গে দুইটি আত্মা বিরাজমান। একটি হইতেছে কবির সৌন্দর্য পিপাসু প্রেমাকূল আত্মা আর অপরটি হইতেছে খাঁটি মুসলিমের প্রাণ—চাঞ্চল্যময় ও প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী আত্মা। কিন্তু জীবনের শেষ অধ্যায়ে রূপপিয়াসী আত্মা গভীর প্রশান্তি লাভ করেও অনেকখানি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আর 'মুসলিম-আত্মা' হইয়া উঠে অত্যন্ত বলিষ্ঠ, সক্রিয়, শক্তিশালী ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী। ফলে কবি তাঁহার হৃদয়গ্রাহী কাব্যপ্রবাহের মারফতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন তাঁহার উদাত্ত পয়গাম। তখন বিশেষ কোন ভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতাও ছিল না তাঁহার; যখন যে ভাষায়ই নিজের বক্তব্য পেশ করা সহজতর মনে করিয়াছেন তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে।

ইকবালের কাব্য নৈরাশ্য, হতাশা ও দ্বন্দ্ব-সংশয়ের ছোঁয়াচ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। কোন প্রকার নিরাশা হতাশা কোনদিনই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই অন্য লোকদের মধ্যেও তিনি কোন প্রকার হতাশা বরদাশ্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নৈরাশ্যবাদীদিগকে তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করিতেন, তাহাদিগকে তীব্র শাণিত বাক্যবাণে জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেন। তিনি তাঁহার পয়গামের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দিক দিয়া ছিলেন নিঃশংক ও দৃঢ়প্রত্যয়। তাঁহার কাব্যাদর্শের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বস্তুত দ্বিধা সন্দেহ, দ্বন্দ্ব সংশয় ও হতাশা কাপুরুষতা হইতে তাঁহার কাব্য মুক্ত ছিল বলিয়াই তাঁহার পয়গাম হইয়াছিল অধিকতর বলিষ্ঠ, হৃদয়গ্রাহী ও প্রচণ্ড প্রভাবশালী।

কিন্তু ইকবালের এই উন্মাদনাময় আবেগ-উচ্ছ্বাস অন্তসারশূন্য নয়। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরতর অধ্যয়নের পরই তিনি নিজ জীবনের জন্যে একটি শাশ্বত আদর্শ ও দার্শনিক মতবাদ নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। বস্তুত 'খুদীর' দর্শনই হইতেছে তাঁহার দার্শনিক মতাদর্শের ভিত্তিপ্রস্তর। এই দর্শনের সহিত যাহার পরিচয় ঘটে নাই, ইকবালের দৃষ্টিতে তাহার জীবনই অর্থহীন। এই দার্শনিক মতাদর্শই ইকবাল কাব্যকে স্ফুরিত ও ক্রমবিকশিত করিয়াছে। ইহার দরুন তাহা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ও শক্তিশালী হইয়াছে। মানুষের দৃষ্টিকে ইহা বিশাল গভীর ও সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছে। ঈমানের নিঃশংক দৃঢ়তায় অত্যন্ত মজবুত করিয়া দিয়াছে মানুষের মন ও মননকে। আর ইহাই মুসলিম মিল্লাতকে দান করিয়াছে এক অভিনব জীবন ও চিন্তা-বিশ্বাসের এক মনোরম জান্নাত।

ইকবাল মানুষের সম্মুখে কোন নূতন পথ ও পন্থা পেশ করেন নাই, সে দাবিও করেন নাই তিনি কখনো। তিনি এই কথাই বারবার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানুষের পথ ও পন্থা শাশ্বত ও চিরন্তন; প্রথম মানুষ সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়া অনন্তকাল পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে একটিমাত্র পথই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়েছেন এবং তাহা হইতেছে ইসলাম ও ইসলামী জীবনধারা। কালস্রোতের আবর্তে পড়িয়া মানুষ এই পথ হইতে বারংবার বিচ্যুত হইয়াছে। তাই প্রত্যেকবার নূতন করিয়া সেই পথে প্রত্যাবর্তন করার সাধনায় লিপ্ত হওয়াই হইতেছে মানুষের স্বাভাবিক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যে দিন স্তব্ধ হইবে, মানবতার অগ্রগতি সেদিন চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

সংস্কার প্রয়াসী মরমী কবি

ইকবালের দেহ-সত্তায় বিরাজিত ছিল এক জীবন-সংস্কারকে সত্যাদর্শী, সত্যানুসন্ধিৎসু ও নিয়ম-শৃঙ্খলাস্থাপক প্রতিভা ও মননশক্তি। ইহাই ইসলামী আদর্শবাদের ভিত্তিতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে কায়েম করিতে চাহিয়াছে নিয়ম-শৃঙ্খলার অপূর্ব প্রশান্তি। ইকবাল ছিলেন কবি, সুক্ষ্ম-দ্রষ্টা বৈজ্ঞানিক দার্শনিকও ছিলেন তিনি। একদিকে মনোবেদনা, দরদ, প্রেম-প্রীতির মর্মান্তিক জ্বালা ও উন্মত্ততা তাঁহাকে অধিকতর মরমী করিয়া তুলিয়াছিল। অপরদিকে জনগণকে তাঁহার প্রদত্ত অমূল্য পথনির্দেশক উপদেশ বাণীসমূহ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছিল জাতীয় নেতার উচ্চতম মর্যাদায়।

ইকবাল কাব্যের তিনটি পর্যায়

বস্তুত মহাকবি ইকবাল সাংস্কৃতিক জগতের মহান নেতা, মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের নিশানবরদার। জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিন্তা ও গবেষণার উচ্চতম মার্গে অবস্থিত এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী তিনি।

ইকবালের আদর্শবাদী কাব্যের সূচনা যখন হয়, তখন দুনিয়ার মুসলমান এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় নিমজ্জিত ছিল। তখন তিনি এক চিন্তানায়ক হিসাবেই মুসলমানদের এই লাঞ্ছিত অধঃপতনের মূল কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং জীবন ব্যবস্থার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন জ্বরাজীর্ণ সংস্কারের অন্ধজালে বন্দী হওয়া এবং কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা হারাইয়া ফেলার কারণেই মুসলিম জাতির এই পতন সম্ভব হইয়াছে। অতঃপর তিনি মুসলমানদিগকে তাহাদের যাবতীয় দোষত্রুটি উল্লেখ করিয়া সংশোধনের আহ্বান জানাইলেন ও তাহাদের সম্মুখে জীবনের বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ এক ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিলেন। ইহার ফলে মুসলিম জনগণের মনে এক তীব্র চেতনা ও অনুভূতি জাগ্রত করিতে ও তাহাদিগকে আযাদী লাভের চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

ইকবালের কাব্যকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 'বাংগেদারা' কাব্যগ্রন্থ হইতে শুরু করিয়া 'আর্‌মগানে হিজাজ' পর্যন্ত ইহার প্রথম স্তর। এই সময় ইকবালের স্টাইল, চিন্তা-পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গী ক্রমাগতভাবে কয়েকটি অধ্যায় অতিক্রম করে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পাঞ্জাবের গোটা পরিবেশ যখন কবি আলতাফ হোসেন হালী ও মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ-এর মর্মস্পর্শী সুরঝংকারে মুখরিত, তখন ইকবাল-কাব্য সবেমাত্র চক্ষু উন্মিলিত করে।

'আসরারে খুদী' ও 'রমুজে বে-খুদী' গ্রন্থদ্বয় হইতে ইকবাল-কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হয় এবং 'বালে জিব্‌রীল'-এ ইহা সমাপ্ত হয়। ইকবাল-কাব্যের প্রথম দিক দিয়া বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল না। ইহা পরবর্তী কালের উৎকর্ষ। তাহা সত্ত্বেও স্টাইলের অভিনবত্বের কারণে বিশেষ ও সাধারণ সকল শ্রেণীর লোককেই তাহা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু 'বালে জিবরীল' হইতে ইকবাল-কাব্যের যে তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়, তাহা ইকবালের কাব্য জীবনে চরম উন্নতি বিধান করে।

ইকবালের কালামকে চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া অনুরূপভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহা হইতেছে ঃ কবিত্ব দর্শন ও আন্দোলনের গতি চাঞ্চল্য। এর সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলা যাইতে পারে যে, ইকবালের অনুভূতি ছিল কাব্যধর্মী, চিন্তাধারা হইতেছে দার্শনিক আর মতবাদ হইতেছে সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক। বস্তুত ইকবালের মন-মগজে মানবীয় সমস্যার যে সমাধান জাগ্রত হইত, তাহার মূল উৎস হইত ইসলামী ভাবধারা, কিন্তু দার্শনিক প্রকৃতির কারণে অবিলম্বেই এই কল্পনাসমূহ দার্শনিক চিন্তা-জটিলতায় জড়াইয়া যাইত। ইহার পর এই সব কল্পনা ও চিন্তাধারার উত্তপ্ত বাষ্প দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কবির মেজাজ-প্রকৃতির সাথে মিলিয়া-মিশিয়া যাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গলিত ধাতুর ন্যায় প্রবাহিত হইত। ইহা হইতে যে উত্তাপ নির্গত হইত, তাহা গোটা পরিবেশকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত উষ্ণ করিয়া রাখিত। তাই ইকবালকে আমরা তিনটি রূপে দেখিতে পাইতেছি। প্রথমত তিনি কবি, দ্বিতীয়ত তিনি দার্শনিক এবং তৃতীয়ত তিনি মরদে মুজাহিদ। এই তিনটি দিকই তাঁহার প্রকৃতি ও চরিত্রে সমানভাবে ও পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনটি দিকের পূর্ণ সমন্বয়ের ফলে ইকবাল হইয়াছেন পাক-ভারত-বাংলাদেশী আরেফ, প্রাচ্যের কবি এবং মিল্লাতের দার্শনিক চিন্তানায়ক। তাই ইকবাল এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব; মুসলিম জাহানের জন্যেই নহে, গোটা মানবতার জন্য তিনি সর্বগুণসমন্বিত এক মহান সৃষ্টি।

ইকবালের কাব্য সর্বতোমুখী ভাবধারা সমন্বিত, ঝটিকা বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রের প্রত্যেকটি রহস্যঘন তরঙ্গই উদ্ভাসিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাব্যে। বস্তুত ইকবাল কাব্যের এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যই আমাকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করিয়াছে।

ইকবালের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই তাঁহার বিরাট কাব্যের সহিত বর্তমান গ্রন্থকারের পরিচয় ঘটে। ১৯৪০ সন হইতে বিশেষভাবে কবি আলতাফ হোসেন হালী, মহাকবি গালেব ও আল্লামা ইকবালের কাব্য আলোচনা ও অধ্যয়নের সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু ইকবাল আমাকে যতখানি আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, অপর কোন কবিই ততখানি করিতে পারে নাই। এই কারণে ইকবালের উন্নত তামদ্দুনিক ও সমাজ বিজ্ঞানমূলক চিন্তাধারার সাথে বাংলা ভাষাভাষী সমাজকে ওয়াকিফহাল করার তীব্র বাসনা আমার মনে জাগ্রত হয়। অতঃপর ১৯৪৬-৪৭ সনে আমি

'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করি। ১৯৫০-৫১ সনে 'মাসিক মোহাম্মদী'র কয়েক সংখ্যায় ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থ উহারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

এই গ্রন্থে ইকবালের কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সমাজ-বিজ্ঞানমূলক চিন্তাধারা সম্পর্কেই আলোচনা পেশ করা হইয়াছে; তাঁহার কাব্যিক সৌন্দর্য ও দর্শন সম্পর্কে আমি ইহাতে বিশেষ কোন আলোকপাত করি নাই। কেননা তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল আলোচনা সাপেক্ষ এবং স্বতন্ত্রভাবেই তাহা পেশ করা বাঞ্ছনীয়।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি বহু সংখ্যক উর্দু বই এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধরাজি হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। কাহারো নাম উল্লেখ না করিয়াই আমি সেই মহান লেখকদের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।

এই বইয়ে উদ্ধৃত ইকবাল কাব্যের অংশসমূহের বাংলা তরজমায় ইকবাল বিশেষজ্ঞ সুসাহিত্যিক অগ্রজ প্রতীম জনাব সৈয়দ আব্দুল মান্নান সাহেবের বিশেষ ধরনকে সর্বত্রই অনুসরণ করা হইয়াছে। কোথাও তাঁহার প্রকাশিত অনুবাদ যথাযথরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে আর কোথাও পাইয়াছি তাঁহার প্রত্যক্ষ সাহায্য। উপরন্তু একমাত্র তাঁহারই উৎসাহ ও প্রেরণায় এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে পদক্ষেপ করার দুঃসাহস করিয়াছি। তিনি এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াও আমাকে ধন্য করিয়াছেন। তাই গ্রন্থ প্রকাশমূহূর্তে তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছি।

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারার এই আলোচনা হইতে তাহার প্রচারিত বিরাট ও মহান আদর্শ অনুসরণ একবিন্দু প্রেরণাও যদি কেহ লাভ করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা' বইখানি ১৯৬০ সালে করাচীস্থ 'ইকবাল একাডেমী'র উদ্যোগে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে বইটির সমস্ত কপি বিক্রয় হইয়া যাওয়ার পর দীঘ দিন যাবত উহার পুনঃ প্রকাশ সম্ভবপর হয় নাই।

অতঃপর ১৯৮৩ সালে বইখানি ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। সেজন্যে আমি আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকর আদায় করিতেছিঁ।

বস্তুত আল্লামা ইকবাল শুধু একজন উঁচুদরের কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা ইসলামী দার্শনিক। তাঁহার কবিতায় ইসলামী জীবন-দর্শন ও জীবন-বিধানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ঝংকৃত হইয়াছে। ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী তদানীন্তন উপমহাদেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজে—বিশেষ করিয়া মুসলিম জনগণের মনে-প্রাণে ব্যাপক ও গভীর উচ্ছ্বাস ও ভাবের জোয়ার জাগাইয়াছিল। একটি আদর্শহীন দিশাহারা মৃতপ্রায় জাতিকে তিনি ইসলামী আদর্শ ও চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পুরোপুরিভাবেই সক্ষম হইয়াছিলেন। সার্থক কবি-দার্শনিকের চিন্তা বিশেষ যুগ-প্রেক্ষিতে গড়িয়া উঠিলেও সময়ের বন্ধন উহাকে কখনই বাঁধিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। তাহা ভাষার গণ্ডীও পার হইয়া চির নতুন রূপ লাভ করে। আল্লামা ইকবালের

ক্ষেত্রে এই কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। সমাজ দার্শনিক আল্লামা ইকবাল আজ হইতে পঞ্চাশ-ষাট বৎসরেরও পূর্বে যেসব আদর্শিক চিন্তাধারা কাব্যের ললিতছন্দে উপস্থাপন করিয়াছিলেন, আজিও— আমূল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও— তাহা কিছুমাত্র পুরাতন হইয়া যায় নাই। দুনিয়ার অসংখ্য ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়া সর্বজনীন ও শাশ্বত মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে ইকবালের চিন্তাধারার ব্যাপক আলোচনা হয় নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার উচ্চমানের আদর্শিক চিন্তাধারা সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এদিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হইলে এদেশের শিক্ষিত মন-মানসিকতা ও চিন্তা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইবে, এই আশা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
২০৮ পশ্চিম নাখালপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

সুচী

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ২১

রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ২৫

রাজনৈতিক চিন্তাধারার উৎস ২৮

ব্যক্তি ও সমাজ ৩০

ধর্ম ও রাষ্ট্র ৩৫

স্বাদেশিকতাবাদ ৪১

জাতীয়তাবাদ ৪৫

গণতন্ত্র ৫২

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র ৫৮

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৬২

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ইসলামী ভাবধারা ৬৮

আদর্শ সমাজ ৭৪

পূর্ণ মানুষ ৮০

ইকবালের পয়গাম রাজনৈতিক না আধ্যাত্মিক ৮৭

উপসংহার ৯২

سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے
حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آذری

সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী
লা-শরীক আল্লাহ
একমাত্র শাহান শাহ্ তিনি
আর সব কিছু আযরের প্রতিমা

بسم الله الرحمن الرحيم

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাহানে ও ইসলামী চিন্তাবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তিনি যদিও কোন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন না, রাজনীতি চর্চা করাও তাঁহার উপজীব্য ছিল না; কিন্তু নিছক কল্পনার পক্ষপুটে ভর করিয়া ভাবলোকে বিচরণ করিতেও তিনি কিছুমাত্র অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং চিন্তারাজ্যে যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেন দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে, সেই সত্যকেই তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্যে চেষ্টা করিতেন সাহিত্যিক আলোড়নের মাধ্যমে। Art for Art's sake-এর প্রচলিত মতবাদের মুকাবিলায় দার্শনিক কবি ইকবাল Art for life's sake-এর আওয়াজ তুলিয়া তদানীন্তন কাব্য ও সাহিত্যের মোড় ঘুরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইকবালের কাব্য পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি একটি বিশেষ বাস্তব জীবন দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই দর্শনকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি তাঁহার কাব্যের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

ইকবাল-কাব্যের ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে জীবন-দর্শনের আকুল জিজ্ঞাসা। তিনি মানুষের সম্মুখে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন পেশ করিয়াছেন। মানুষের জটিল জীবন-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানই ছিল ইকবাল কাব্যের প্রধানতম লক্ষ্য। শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও রাজনীতি এবং ধর্ম ও তমদ্দুন—এক কথায় মানব-জীবনের সকল অপরিহার্য দিকেই রহিয়াছে ইকবাল-দর্শনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অতএব ইকবাল শুধু ভাববিলাসী কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবন দর্শনের কবি।

জীবনাদর্শের বাস্তব রূপায়ণ হয় রাজনৈতিক মতবাদ বা চিন্তাধারার মাধ্যমে। তাই ইকবালের জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করিতে হইলে তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। বস্তুত ইহার মাধ্যমেই আমরা জানিতে পারিব ইকবালকে—বুঝিতে পারিব তাঁহার

জীবনাদর্শকে। এইজন্যে এখানে আমরা বিশেষভাবে তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কশীল বিষয় সম্বন্ধেই আলোচনা পেশ করিব।

আল্লামা ইকবাল রাজনীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার সকল প্রকার রচনায়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণে ভরপুর রহিয়াছে। এই কারণে ইকবাল-সাহিত্যকে নিছক কাব্য বা সাহিত্য হিসেবে দেখিলেই যথেষ্ট হইবে না, বরং তাঁহার বিরাট সাহিত্য কেবলমাত্র কাব্যরস পরিবেশন ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর নৈতিক আদর্শ ও বৃহত্তর কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান দেয় কিনা সচেতন দৃষ্টিকোণ লইয়া তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

বস্তুত ইকবাল একজন আদর্শবাদী সমাজ-সংস্কারক ও সত্যনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন বলিয়া বিশ্বের বিবর্তনশীল রাজনীতি উহার দোষ-ত্রুটি সংশোধন এবং আল্লাহ্‌র বিধানের স্থায়ী বুনিয়াদে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার হইয়া থাকিতে পারেন নাই। ইকবালের কাব্যকে কখনই রাজনৈতিক চিন্তাধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যাইতে পারে না। এই জন্যে বলিতে হয় ঃ ইকবালের কাব্য ও রাজনীতি দান্তের কাব্য ও ফারিঙ্গের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মতই পরস্পর বিজড়িত ও অবিচ্ছিন্ন।

ইকবাল যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবন ও জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এক অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর বিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছিল। একদিকে প্রাচ্যের রাজতন্ত্র, শোষণ-পীড়ন ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচার নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, অপরদিকে প্রাচ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃংখল চিন্তাধারার প্রবল আধিপত্যও স্থাপিত হইতেছিল। প্রাচ্য দেশবাসী—বিশেষত মুসলিম জাতির মনন ও দৃষ্টি পাশ্চাত্যের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারমূলক মতাদর্শের উদ্দাম ঝটিকার সম্মুখে শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতোই মূহ্যমান হইয়া পড়িতেছিল। চারিদিকে এক মহাবিপর্যয় ও জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড চূর্ণ হইবার সুস্পষ্ট লক্ষণ তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হইতেছিল। গোলামী মনোবৃত্তির চরম দৃষ্টান্ত এই ছিল যে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পশ্চিম দেশের অন্ধ অনুসরণ একটি অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিল।

ইকবাল যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের সম্মুখে শিক্ষার্থী হিসাবে নতজানু হইয়া বসিতে এবং পশ্চিমী সভ্যতার ভাণ্ডার হইতে আকণ্ঠ মধু পান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচ্য দেশের পীর মুর্শিদের নিবিড় সাহচর্যের প্রভাবেই হউক আর আল্লাহ্ প্রদত্ত সৌভাগ্যের দৌলতেই হউক—একথা অত্যন্ত সত্য যে, ইকবাল ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও মতবাদের যত ঘনিষ্ঠতর পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁহার মন ততই বিক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। বস্তুত পশ্চিমী রাজনীতির কল্পনামূলক (Theoretical) শিক্ষা এবং জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে এই প্রবঞ্চনাময় সভ্যতার সর্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। জানা যায়, তিনি বার্গসোঁ হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ দার্শনিকের মতবাদ সম্পর্কে যতই গভীরভাবে গবেষণা করিতেন, ততই তাঁহার মনে বস্তুবাদের (Materialism) বিরুদ্ধে একটা চরম বিতৃষ্ণা ও তীব্র বিদ্বেষের মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। অনুরূপভাবে ইকবাল যতই পশ্চিমী সুধীবৃন্দ রচিত গ্রন্থাবলী গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, ততই তিনি তাহাদের জীবন দর্শনের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। 'আর্‌মগানে হিজাজ' গ্রন্থে কবির পরিণত বয়সের চিন্তাধারা স্বতস্ফূর্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে; তাহাতেই তিনি পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তীব্য ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

مئ ازمیخانہ مغرب چشیدم
بجان کن کہ دردسر خریدم
نشستم بانکو یان فرنگی
ازاں بے سود ترروز ے ندیدم

পশ্চিমের শরাবখানায় আমি পান করেছি রঙিন সুরা,
তাতে লাভ হয়নি কিছুই আমার
শির-পীড়া ব্যতীত,
পশ্চিমী পূর্ণাত্মাদের সাহচর্য লাভ করেছি আমি দীর্ঘকাল,
নিরর্থক সময় কাটেনি আমার
তার চেয়ে আর কোনদিন।

প্রাচ্য দেশের নানাবিধ চরম দুরবস্থা ও নিত্য-নৈমিত্তিক দুঃখ ও লাঞ্ছনার তীব্র অনুভূতি ধীরে ধীরে ইকবালের মস্তিষ্কের গোপন পর্দায় চিন্তাধারার এক নবতর গুলবাগিচা রচনা করিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার স্বাধীন তুলনামূলক আলোচনা এবং পারস্পরিক মিশ্রণ ও সংযোগের ফলে এক নূতন রাজনৈতিক দর্শন ইকবালের মুগ্ধকর সঙ্গীতের সুর লহরীর সাথে নিবিড়ভাবে মিশিয়া দুনিয়ার বুকে বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাঁহার এই রাজনৈতিক মতাদর্শ শুধুমাত্র প্লেটো (plato), এরিস্টটল, মেকিয়াভেলী, হাকিন্স, কান্ট ও রুশোর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতেই সংগৃহীত হয় নাই, তাঁহার মর্মমূলে সবচেয়ে বেশি উপাদান ও অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে কুরআন-হাদীস, গাজ্জালী ও আল-রাযী, মাওয়ার্দী ও নিজামুল মুলক, ইবনে হাজম ও ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা ও মতবাদ। শুধু ইহাই নয়, প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ ও সামাজিক আবেষ্টনীও এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়াছে ইহার সৃষ্টি ও সংগঠনে।

অবশ্য একথা সত্য যে, ইকবালের রাজনৈতিক মতবাদ তাঁহার নিজ জীবনে ইউরোপ বা তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষে খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু তবু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, ইকবালের শিক্ষা ও মতবাদ—যাহাকে তিনি ভাবীকালের কবি হিসাবে 'আগামী দিনের' পরিবর্তে 'অদ্য'ই প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা ঠিক তখনকার পরিবেশের উপযুক্ত ছিল না। সেই সঙ্গে ইহাও অনস্বীকার্য যে, তাহার মতবাদ ও জীবনাদর্শের সত্যতা ও যৌক্তিকতা তাহার জীবনকালেই প্রকাশ লাভ করিয়া সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় যে, মুসলিম সমাজের উপর তাহার আদর্শ তেমন বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহারা পশ্চিমী সভ্যতা ও মতবাদের বন্যাপ্রবাহে এমন তীব্র গতিতে ভাসিয়া গিয়াছিল যে, ইউরোপকেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের দ্বীন-দুনিয়া—ইহকাল-পরকালের সকল শান্তি ও কল্যাণ লাভের জন্যে একমাত্র আদর্শরূপে।

রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ

ইকবালের পাঠকদের মধ্যে সাধারণভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, ইকবালের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়াছে—বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থার কারণে তাঁহার চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। তাই 'আসরারে খুদী'র সমালোচনা করিতে গিয়া মিঃ ফরেস্টার লিখিয়াছেন— "ইকবাল চিরদিন একই মতে দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে নাই।" এই অভিযোগের সমর্থনে সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে, ইকবাল এক সময় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিল এবং ভাবাবেগের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া এককালে তিনি 'তসবীরে দরদ' (تصویر درد) 'তারানায় হিন্দী' (ترانہ ہندی) 'নয় শেওয়ালা' (نیا شیوالہ) এবং হিন্দুস্তানী বাঁচ্চুকী কাওমী গীত' (ہندو ستانی بچوں کی قومی گیت)-এর ন্যায় ঘোর জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশিকতার উদ্দাম উন্মাদনা ও ভাবালুতাপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরই তাঁহার চিন্তাধারা ও মতাদর্শে বিপ্লব সূচিত হয় এবং তিনি সংকীর্ণ স্বদেশিকতার আকর্ষণ পরিহার করিয়া 'বিলাদে ইসলামীয়া' (بلاد اسلامیہ) 'তারানায়ে মিল্লী' (ترانہ ملی), 'খিতাব ব-জওয়ানানে ইসলাম' (خطاب بجوانان اسلام) 'শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া' (شکوہ و جواب شکوہ) এবং এই ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় ও প্রকৃত ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহার পর পুঁজি ও শ্রমের (Capital and Labourr) পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অতঃপর ফ্যাসীবাদে প্রভাবান্বিত হইয়া Fascism-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। মোটকথা, অভিযোগকারীদের কথা অনুযায়ী ইকবাল এইভাবে বারংবার পরিবর্তিত হইয়া নূতন নূতন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুত এইদিক দিয়া ইকবালের মতবাদে কিছুটা বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়; যথা—ফ্যাসীবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই স্তুতি করা, দরবেশী ও বাস্তব ক্ষমতা লাভ এবং এতদুভয়েরই বিজয় গাঁথা রচনা ও বৈশিষ্ট্য প্রচার করা। বাহ্য দৃষ্টিতে এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু

ইহার মাধ্যমে একটি গভীর তত্ত্ব আমরা অনায়াসেই লাভ করিতে পারি। ইকবাল বিশ্বপ্রকৃতির গভীরতর পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যেসব বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিণতি ও পরিপক্কতা লাভ করার মূলে সেসবের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এককালে ইকবাল ভারতের কোন কোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই মতবাদ গঠনের মূলে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যেসব উপরোপীয় পণ্ডিত সাধারণভাবে জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও দেশপ্রেমকে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা গবেষণার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নই অধিকতর দায়ী।

একথা সত্য যে, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের সম্মুখে বহু ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিও চক্ষু অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আল্লামা ইকবালও পশ্চিমী চিন্তাধারার মায়া-মরীচিকার মোহে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন অনেক দিন। কিন্তু ইহার পরেই প্রাচ্যের শিক্ষা-দীক্ষায় গভীর পাণ্ডিত্য লাভ, ইসলাম ও প্রাচ্য তমদ্দুনের মর্মকথার বলিষ্ঠ অনুভূতি, ইউরোপ ভ্রমণ এবং পশ্চিমী তমদ্দুনের নিকটতর পর্যাবেক্ষণ, ব্যাপকতর অধ্যয়ন ও গবেষণা-বিশ্লেষণ অচিরেই উঁহার বাহ্যিক রূপের নেশা কাটাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে ইকবাল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وائے برسادگی ماکہ فسو نش خوریدم
رھزنے بود کمین مردہ رہ ادم زد

ধিক আমার সরলতায়!
প্রতারিত হয়েছি আমি
পশ্চিমী সভ্যতার ইন্দ্রজালে,
মানুষের চলাপথের গোপন বাঁকে
লুকিয়ে থেকে তারা করে রাহাজানি

ইকবালের ইউরোপ পরিদর্শনের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার মনে একটা তীব্র আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয়, যখন তিনি ইউরোপকে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলেন, ঠিক তখনই তাঁহার মনে ও চিন্তারাজ্যে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি

একটি ভীষণ বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠে এবং তাহা তাঁহার মানসপটে চিরদিনের তরে বদ্ধমূল হইয়া যায়। অবশ্য তাহার অর্থ এই নয় যে, ইকবাল ছিন্নপত্রের ন্যায় বায়ুর প্রত্যেকটি দোলার সঙ্গে সঙ্গে বদলিয়া যাইতেন এবং যুগের একটি সামান্য বিপ্লবের সূচনায় তিনিও নূতন সুর ভাঁজিতে শুরু করিতেন। বরং ইহার অর্থ এই যে, ইকবাল সর্বপ্রথম তাহার নিজের রাজনৈতিক চিন্তা-গবেষণা পরিচালনার জন্যে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ কেন্দ্রবিন্দু ঠিক করিয়া লাইয়াছিলেন, চারিপার্শ্বের সমগ্র সক্রিয় ও গতিময় শক্তি এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সকল রাজনৈতিক ও তমদ্দুনিক বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজের চিন্তা-গবেষণার একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাঁহার আদর্শ প্রচারের কাজে। কালের প্রত্যেকটি আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগের যে নূতন হাওয়া বহিয়াছে, সাম্প্রতিক সভ্যতা যে বৈচিত্র্য—যে রং-বেরংগের আকার ও রূপ ধারণ করিয়াছে ইকবাল তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত একই দৃষ্টিকোণ লইয়াই উহার বিচার ও যাচাই করিতেন। ফলে কোথাও স্ববিরোধী মতবদ প্রকাশ হইয়া পড়িলেও সেজন্যে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জীবন ও জগতকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ব্যাপারে ইকবাল ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বস্তুত নবী ও কবির মধ্যে এইখানেই পার্থক্য। নবী বিশ্ব প্রকৃতির গভীরতর তথ্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ও প্রত্যক্ষভাবেই অবহিত হইয়া থাকেন; কিন্তু কবির পক্ষে ঘটনার আবর্তন ও কাল প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের চলার পথ বাছিয়া লওয়া এবং নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পানের অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। উপরন্তু এই সবের সঠিক বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণের জন্যে একটি বাহ্যিক কার্যকারণের একান্তই প্রয়োজন। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য যে, কবির অনুভূতি সাধারণ মানুষের অনুভূতি অপেক্ষা অধিকতর তীব্র, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মগামী হইয়া থাকে। ইকবাল ইউরোপ গমনের পূর্বে ভারতের স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা অত্যধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনধারা ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি, কুটিলতা ও পংকিলতা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁহার সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহা হইতে চিরদিনের জন্যে 'তওবা' করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইকবাল তাঁহার চিন্তা ও কল্পনার গুলবাগিচা ফুলে-ফলে সুশোভিত ও ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিবার জন্যে কোন্ কোন্ উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ? তাঁহার মতবাদকে আধুনিকরূপে রূপায়িত করিবার ব্যাপারে কোন্ কোন্ বলিষ্ঠ প্রভাব তাঁহার অন্তরে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে ? এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মতে ইকবাল খুব বেশি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন উইলিয়াম, ব্লেক, নিটশে এবং বার্গসোঁর নিকট হইতে। কিন্তু মনে হয় ইকবাল ও নিটশে অথবা ইকবাল ও বার্গসোঁর মধ্যে কোন কোন ব্যাপারে মতৈক্য ও সাদৃশ্য পাওয়া যায় বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই ধারণার অন্য কোন ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। ইহা একটি সুস্পষ্ট সত্য যে, ইকবালের সমস্ত মতবাদ উল্লিখিত দার্শনিকদের নিকট হইতে গৃহীত হওয়ার ধারণা চিন্তা ও মতবাদে এই সামান্য মাত্র মতৈক্য ও সামঞ্জস্যের দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে না। আসল কথা এই যে, তিনি পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি তাহা ঘনিষ্টভাবে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। ফলে কোন কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মতের সাথে তাঁহার মত মিলিয়া গিয়াছে আর কাহারো সাথে সৃষ্টি হইয়াছে ধারণার মৌলিক সংঘাত। নিছক দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া নিট্‌শে, ফিশ্‌টে এবং বার্গসোঁর চিন্তাধারা ইকবালের খুবই আকর্ষণের বস্তু ছিল। 'খুদী' দর্শনের মূল উপাদান তিনি ফিশ্‌টের নিকট হইতে আহরণ করিয়াছেন এবং সংগ্রাম (struggle) ও 'আত্মশক্তি প্রবর্ধনে'র মতবাদ নিট্‌শের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে—এইরূপ ধারণা অনেকের মনেই বিদ্যমান। অনুরূপভাবে 'জ্ঞানের উৎস—প্রেম' এবং 'কাল' ও সময় (Time) সম্পর্কিত ধারণা বার্গসোঁর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করেন।

ইকবালের রাজনৈতিক মতবাদের কয়েকটি অংশ রহিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটি অংশেই তিনি কোন-না-কোন প্রকারের সমসাময়িক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। বিগত শতকের শেষ ভাগে গণতন্ত্র

(Democracy)-কে একটি সর্বোত্তম ও নিখুঁত শাসন প্রণালী বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইউরোপের কোন কোন দার্শনিক মনীষী এই মতবাদের উপর তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিট্শে, লিবন, ফনট্রয়টস্কী, শপিংলার, স্ট্যাডার্ড, ম্যাগডোগল প্রমুখ চিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইকবালের প্রাথমিক কালের জাতীয় দর্শন এবং গণতান্ত্রিক মতবাদ বিগত শতকের উপরোপীয় চিন্তাধারার অত্যুগ্র প্রভাবের ফল, সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনের শেষ অধ্যায়ে ইকবাল বিশ্বের সকল প্রকার মানব রচিত মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং পরিণত বয়সে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন ইসলামের ঐতিহ্য ও কুরআন হাদীসই তাহার একমাত্র উৎস বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হইবে না। এই জন্যেই তাঁহার পরিণত বয়সের রচনাবলী হইতে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ঐতিহ্যের মর্মস্পর্শী ঝংকার অনুরণিত হইয়া উঠে।

অতঃপর আমরা তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। ইহার মাধ্যমে ইকবালের রাজনীতি দর্শন আমাদের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

ব্যক্তি ও সমাজ

ইকবালের রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক ও সঠিক ধারণা লাভ করিতে হইলে সর্বপ্রথম ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁহার মত ও দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়া লওয়া একান্তই আবশ্যক। কেননা ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কই হইতেছে মানব সমাজে যাবতীয় সমস্যার মূল ভিত্তি। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কি, এই প্রশ্নের উত্তর যেরূপ হইবে, সমাজ সম্পর্কিত মতবাদের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলিও অনুরূপই হইবে। বস্তুত এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের বিভিন্নতাই হইতেছে রাজনীতিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের পারস্পরিক মতভেদের মূল কারণ। এইজন্যে আমরা এখানে ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে 'ব্যক্তি ও সমাজ' সম্পর্কে ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করিব।

বস্তুত ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক কি, কি এই সম্পর্কের স্বরূপ ও ধরন, মানব সমাজের ইহা এক চিরন্তন ও মৌলিক প্রশ্ন। ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে সমাজগর্ভে বিলীন করিয়া দিবে কিংবা নিজের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে বজায় রাখিবে ও উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে ? ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যে কি কোন চিরন্তন বৈষম্য রহিয়াছে, না ইহাদের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব ?—ইকবাল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানব প্রকৃতির এই গভীর রহস্যপূর্ণ সমস্যার কথা সঠিকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, যে সমাজে স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা আত্মসংরক্ষণ, লালন-পালন ও ক্রমবিকাশের সুযোগ লাভ করিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সমাজ-জীবন যাপন ও সামগ্রিক উন্নতি বিধান প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে, বস্তুত তাহাই হইতেছে স্বভাব-নিয়মের সহিত সামঞ্জস্যশীল সমাজ। কেননা স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার সমাহার ব্যতীত যেমন সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে না, অনুরূপভাবে 'খুদী' বা ব্যক্তিসত্তাও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না সমাজ সম্পর্ক ব্যতিরেকে। কাফেলার প্রত্যেকটি যাত্রী সকলের সঙ্গে প্রতিপদে তাল রক্ষা করিয়া অগ্রসর হয়, আবার অন্যান্য সকল হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহার ব্যক্তিসত্তা অক্ষুণ্ন রাখিয়াও সে চলে। মনুষ্য জাতির এই বিরাট কাফেলার অবস্থা ইহা হইতে ভিন্নরূপ নহে।

ইকবালের মতে ব্যক্তিকে অবশ্যই সমাজ জীবনের নৈতিক মূল্যমানের অধীন থাকিতে হইবে। অন্যথায় কোন তমদ্দুনই গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। এইজন্য ব্যক্তির বাস্তব ও আধ্যাত্মিক—উভয় দিকই সমানভাবে সমাজ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হওয়া সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। একথা অনস্বীকার্য যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বিশ্বে ব্যক্তির আত্মসচেতনতার মধ্যেই সর্বোচ্চ মূল্যমান নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু ইকবালের মতে এই চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ততক্ষণ পর্যন্ত হইতে পারে না, যতক্ষণ না ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেকে জাতি ও সমষ্টির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া দেয় এবং জীবনের ক্রমবিকাশ লাভের লক্ষ্যকে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা দ্বারা পূর্ণতা দান করে।

فردرا ربط جماعت رحمت است
جوهر اورا کمال ازملت است
تاتوانی باجماعت یارباش
رونق هنگا مه احرار باش
فرد می گیرد زملت حترام
ملت از افراد می یابد نظام

সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক
রহমতের প্রতীক,
ব্যক্তিপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়
সমাজের সাহচর্যে,
জীবন যাপন কর তুমি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে,
তুমি হও স্বাধীন সমাজের আলোক মশাল!
ব্যক্তি অর্জন করে গুরুত্ব সমাজ থেকে,
সমাজ লাভ করে তার সংহতি
ব্যক্তির ভিতর দিয়ে।

ইকবাল যদিও আত্মসচেতনতা ও মুক্তি-আদর্শের অগ্রদূত, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী (Individualist) দার্শনিকদের ন্যায় তিনি নিজের মতাদর্শের স্বাভাবিক সীমা কখনই লংঘন করেন নাই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের (Individualism) এক প্রান্ত হইতেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য। নিট্শের আত্মদর্শনে সুবিচার ও সাম্যের নৈতিক মূল্যমান এবং রাষ্ট্র ও

সমাজের সকল প্রকার দায়িত্বকে মনে করা হইয়াছে প্রতারণা। নিট্শের এই নৈরাজ্যবাদ (Anarcism) তাঁহার জীবনদর্শনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদে বিশ্বাসীরা চরম ও নিরংকুশ স্বাধীনতার দাবিদার হইয়া থাকে।

ইকবালও 'খুদীর' বিকাশ লাভের জন্যে ব্যক্তিগত আযাদীকে অপরিহার্য মনে করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন সামাজিক নিয়ম শৃংখলা ও সাম্যের প্রয়োজনীয়তা। কেননা, তাঁহার মতে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশলাভ করা এতদ্ব্যতীত কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ ও সামাজিক নিয়ম-শৃংখলা বাহ্যদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয়ের মূল ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার ও যাচাই করিলে তাহাতে কোনরূপ বৈষম্য বা অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইবে না। ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার এই দুইটি দিকের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দিকে গণতন্ত্র ব্যক্তিকে নিরংকুশ স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রয়োগের অবাধ ও অপ্রতিরোধ্য সুযোগদানের পক্ষপাতী। অপরদিকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মানব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তাকে সমাজসমুদ্রের অতল গর্ভে বিলীন করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। প্রথমোল্লিখিত মতবাদের পরিণাম পুঁজিবাদী সমাজ ও সভ্যতা। ইহা ব্যক্তিকে যথেচ্ছ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সম্পদ উৎপাদনের সকল পথ ও পন্থাকে সকল প্রকার সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্ত রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'টোটালিটারিয়ান' (Totalitarian) রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যুত্থান হইয়াছে। সেখানে ব্যক্তিকে সমাজ-স্বার্থের বেদীমূলে 'বলিদান' করা হইয়াছে।

কিন্তু যেভাবে নিছক ব্যক্তিসত্তার বিশ্লেষণ করা যায় না—কেননা উহা Abstract মাত্র, অনুরূপভাবে ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সমাজ সম্পর্কে ধারণা করাও সম্ভব নয়। জীবনের যেমন ব্যক্তিগত দিক রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে উহার সামাজিক ও সামগ্রিক দিক। ইকবাল তাঁহার জীবন দর্শনের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ম-শৃংখলার পারস্পরিক বৈষম্য দূরীভূত করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিকে সমাজ তথা জাতির জন্যে এবং সমাজ ও জাতিকে ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

درجماعت فردرا بینم ما
ازچمن اورا چوگل چنیم ما
فطر تش وارفته یکتائی است
حفظ او از انجمن آرائی است

ব্যক্তির বিকাশ আমি দেখেছি
সমাজের মাঝখানে,
বাগিচার বুক থেকে ফুলের মতো
আমি আহরণ করেছি তাকে।
যদিও ব্যক্তি প্রকৃতি
স্বভাবতই স্বাতন্ত্র পিয়াসী
তবু তার ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত হয়
সমাজের আবেষ্টনে।

বস্তুজগতের অণুপরমাণুর ন্যায় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণও পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এক গভীর আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং নৈতিক মূল্যবোধই হইতেছে এই বন্ধনের ভিত্তি। বস্তু পরমাণুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব হইলেও মানুষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অসম্ভব; মনস্তত্ব ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। উচ্চতর সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হইতেছে উন্নততর ব্যক্তি গঠন। মানবীয় বিবর্তনের চরম লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মূল্যমানের সুসমঞ্জস সমন্বয় সৃষ্টি করা। এই দিক দিয়া যে সমাজ সাফল্য লাভ করিতে পারিবে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমাজই সক্ষম হইবে জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে।

فرد و قوم آئنه يك ديگر اند
سلك ودوهر كهكشاں واختر اند
فردتا اندر جماعت گم شود
قطرهء وسعت طلب قلزم شود
دردلش ذوق نمود ازملت است
احتساب كاراوازملت است

هرکه اب از زمزم ملت نخورد
شعله هائے نغمه درعو دش فسرد
فردتنها ازمقاصد غافل است
قوتش اشفتگی را مائل است
قوم باضبط آشنا گرداندش
نرم آومثل صباگرداندش

ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের দর্পণস্বরূপ,
যেমন করে সূত্রে গ্রথিত থাকে মুক্তামালা,
তারকারাজি মিলিত হয়ে যেমন
রচনা করে ছায়াপথ
ব্যক্তি যখন নিজকে হারিয়ে ফেলে সমাজের মাঝে
ব্যাপ্তিপ্রয়াসী বিন্দু পরিণত হয়
মহাসমুদ্রে।
সমাজ তাকে অনুপ্রাণিত করে
আত্মবিকাশের আকঙ্ক্ষায়,
সমাজের মান নিরূপিত হয়
তারই কার্য দ্বারা।
পান করে না যে সমাজের আবে-যমযম,
বীণার তন্ত্রীতে তার সঙ্গীতের অনল শিখা
হয়ে যায় ছাই!
আপনার দ্বারা ব্যক্তি হয় উদাসীন
তার আপন উদ্দেশ্যে,
শক্তি তার হয়ে আসে ঘুমন্ত;
সমাজ এনে দেয় তাকে আত্মনিষ্ঠা;
করে তোলে তার গতি ছন্দময়
মৃদু হাওয়ার মত।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রাচীন বিতর্কে ইকবাল ধর্মহীন রাষ্ট্রের (Secular State) প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মার্টিন লুথার খৃষ্টবাদের ভয়ানক শত্রু, কেননা তিনিই ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দুইটি বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইউরোপে যে জীবন দর্শনের প্রভাবে ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে জড় ও আত্মার (Matter and Spirit) দ্বৈতবাদ। এই ভ্রান্ত দর্শনই মানবতার কাফেলাকে বস্তুবাদের (Materialism) ঊষর মরুতে বিভ্রান্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘুরিয়া মরিতে বাধ্য করিয়াছে। ইকবালের দৃষ্টিতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য—ইহাদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর ইহাদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। ইকবালের রাষ্ট্র দর্শনের দেহ ও প্রাণ—জড় ও আত্মা দুইটি অবিচ্ছিন্ন মৌলিক উপাদান। 'গুলশানে রাজই জাদীদ' গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন ঃ

تن وجان رادو تا گفتن کلام است
تن وجان راد وتا دیدن حرام است
کایسا سبحه بطرس شمارد
که بااو حاکمی کارے نه دارد
بدن راتا فرنگ ازجان حدا دید
نکاهش کلك ودين راهم دوتا دید
به تقلید فرنك ازخود را میدند
میان ملك ودين ربطے ندیدند

বস্তু ও আত্মার দ্বিধাবিভক্তি আপত্তিকর;
বস্তু ও আত্মাকে ভাগ করা হারাম।
গীর্জা শুধু জপমালা নিয়ে থাকলো বিব্রত,
রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক সে করলো অস্বীকার।

পশ্চিমী দর্শন গড়ে উঠলো
বস্তু ও আত্মার দ্বৈতবাদের উপর।
দৃষ্টিতে তার
রাষ্ট্র ও ধর্ম হলো স্বতন্ত্র।
পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে
এই জাতি হলো বিভ্রান্ত
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সে হলো বিস্মৃত।

ইকবালের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া রাষ্ট্র ও নৈতিকতার পূর্ণ সমন্বয়ে, শক্তি ও পরাক্রম এবং ফকীরী ও বাদশাহীর সামঞ্জস্য সাধনেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। হযরত জুনাইদের দুনিয়াবিমুখতা ও আর্দশিরের রাষ্ট্র দখল একত্র সমন্বিত হইলে চিন্তা ও কর্মের এমন এক জীবন্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠা সম্ভব, যাহার দরুন মানুষ তাহার নিয়তিকে পরিপূর্ণতা দান করিতে পারে। অন্যথায় মানবতার উত্থান চরমভাবে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ইকবালের দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতা যে রাষ্ট্রনীতি উপস্থাপিত করিয়াছে তাহা একটি বল্গাহীন দৈত্য ছাড়া কিছু নয়। যাহারই উপর করাল দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین
واهر من ودوں نہاد مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترک کایشا سے حاکمی ازاد
فرنگیوں کسی سیاست ہے دیو بے زنجیر

আমার দৃষ্টিতে বর্তমান রাষ্ট্রনীতি
ধর্মের প্রভাবমুক্ত,
শয়তানের ক্রীতদাসী, নীচ প্রকৃতি,
আত্মা তার মৃত।
গীর্জার প্রভাব যখন হল বিবর্জিত
শাসন-ক্ষমতা হল মুক্ত, স্বেচ্ছাচারী
পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতি হল
বল্গাহীন দৈত্যের মতো।

'রমুজে বে-খুদী' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

تاحکومت مسند مذهت گرفت
ابں شجر درگاشن مغرب گرفت
فصه دین مسیحائی فسرد
شعله وشمع کایسائی فسرد

রাষ্ট্র যেদিন দখল করলো ধর্মের মর্যাদা,
ঈসায়ী ধর্মের সেদিন হলো অবসান,
নিভে গেলো গীর্জার শেষ স্ফুলিঙ্গ।
পাশ্চাত্যের বাগিচায় জন্ম নিল এ বিষবৃক্ষ।

'বালে জিব্‌রীল' গ্রন্থে 'দুনিয়া ও সিয়াসত' শীর্ষক যে কবিতা তিনি লিখিয়াছেন, তাহাকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম ও জরুরী সম্পর্কের প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ঃ

هوئی دین ودولت میں جس دم جدائی
هوس کی امیری هوس کی وزیری
دوئی ملك ودین کے لئے نامرادی
دوئی چشم تہذ یب کی نابصیری

ধর্ম ও রাষ্ট্র যেদিন হলো স্বতন্ত্র
সর্বত্র কায়েম হলো লালসার আধিপত্য।
রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়েই হলো ব্যর্থতার সূচনা,
এই স্বাতন্ত্রই হলো সভ্যতার অদূরদর্শিতার প্রমাণ।

উক্ত গ্রন্থের আর একটি পংক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

جلال پاد شاهی هوکه جمهوری تماشا هو
جداهو دین سیاست سے توره جاتی هے چنگیزی

বাদশাহী-বিক্রম আর গণতন্ত্রের তামাসা,
ধর্ম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে
অবশিষ্ট থাকে শুধু চেংগিজী নীতি।

'জরবে কলীম' গ্রন্থের একটি কবিতায় ধর্মহীন রাজনীতিকে ইকবাল 'ভূতের কন্যা' ও 'পংকিল মনোবৃত্তির পরিচায়ক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য রাজনীতির কাণ্ডারীদিগকে 'শয়তানী প্রথার প্রতিনিধি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইকবালের মতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই বিচ্ছিন্নতা ও দ্বৈতবাদ মানবতার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই ভুল মতাদর্শের গোলকধাঁধা হইতে বিশ্বমানবতাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই দ্বৈতবাদকে চূর্ণ করিয়া মানব জীবনের স্বাভাবিক একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং রাষ্ট্রশক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত করিয়া দিয়াছে।

یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا
بشیری ہے آئنہ دار نذیری
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی
کہ ہوں ایک جنیدی وارد شیری

এ হচ্ছে এক মরুবাসীর কৃতিত্ব
মানবরূপেই তিনি হয়েছেন
মানবতার পথ প্রদর্শক।
তারই আদর্শ হচ্ছে মানবতার রক্ষাকবচ
একই ব্যক্তির মধ্যে হয় শাহী ও দরবেশীর সংমিশ্রণ।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। আর ইউরোপে এই ধর্ম বিবর্জিত রাজনীতির প্রবর্তক হইয়াছেন মেকিয়াভেলী। মেকিয়াভেলী স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়াছেন ঃ নাগরিকগণ ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্ম ও নৈতিক বিধান পালন ও অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রকে উহার ঊর্ধ্বে থাকিতে হইবে। রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকিবার এবং উত্তরোত্তর শক্তি ও প্রতিপত্তি পরিবর্ধনের জন্যে প্রতিনিয়ত চেষ্টানুবতী থাকিতে হইবে। সেজন্যে উহাকে যে কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হওয়া চলিবে না। অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছুমাত্র উপকারী হয়, তবে তাহা করিতেও কোন বাধা থাকিতে পারে

না। বস্তুত এই ধোঁকাবাজী, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী কর্মপন্থাকেই ইকবাল 'মেকিয়াভেলী রাষ্ট্রনীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আল্লামা ইকবাল এই ফরাসী দার্শনিককে সম্পূর্ণরূপে 'বাতিল পন্থী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ঃ

آن فلارنساوئی باطل پرست
سرمه دیده اومردم شکست
نسخه بهر شهنشا هان نوشت
ودگل ما دانه پیگار کشت
فطرت او سوئے ظلمت برده رخت
حق زتیغ خانه اولخت لخت

সেই ফ্লোরেন্সবাসী অসত্য পূজারী
অন্ধ করেছে মানব আঁখি
তার অঞ্জল স্পর্শে।
লিখেছে সে নূতন কানুন
শাসকদের পথ নির্দেশের জন্যে
বপন করেছে সে যুদ্ধের বীজ
আমাদের দেহ মৃত্তিকায়;
প্রকৃতি তার অন্ধকার পথের যাত্রী,
সত্য ও আদর্শ হয়েছে বিচূর্ণ
তার তরবারির আঘাতে।

ইকবাল কোন রাষ্ট্রকেই নৈতিক নিয়ম-বিধান হইতে মুক্ত দেখিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নৈতিক বিধানের অধীন ও অনুগত হইতে হইবে। অন্যথায় মানবতার চরম বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ইকবালের মতে মানবতাকে এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

The Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে ইকবাল বলেন ঃ

Islam as a polity, is only a practical means of making this principle (of tawhid) a living factor in the intellectual and

emotional life of mankind. It demands loyalty to God and not to thrones. And since God is the ultimate spiritual basis of all life, loyalty to God actually amounts to man's loyalty to his own ideal nature.

"এই (তওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ব) নীতিকে মানুষের চিন্তাজগতে ও ভাবজগতে জীবন্ত রূপ দেয়াই কার্যত ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রবিধানের সবচেয়ে বড় কাজ। ইসলাম দাবি করে একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য, কোন সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহ্‌ই সমগ্র জীবজগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল নিদান, আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের নামান্তর।"

(ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন)

এমনকি এক শ্রেণীর আলেম নামধারী লোক যে কেবলমাত্র ধর্মীয় দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না—ইকবাল তাহাদিগকেও তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করিয়াছেন। এক স্থানে তিনি এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'মোল্লা' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ

ملا کو جو ہے مسجد میں سجدہ کی اجازت
نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے ازاد

মোল্লা লাভ করেছে মসজিদে সিজ্‌দার স্বাধীনতা,
নির্বোধ সে, একেই সে মনে করে ইসলামের আযাদী।

স্বদেশিকতাবাদ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বদেশিকতাবাদ (وطنیت)-কে সমাজ-সংস্থার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে; ইহাই হইতেছে ইহার দ্বীন, ইহাই হইতেছে ঈমান। বস্তুত ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ পরিত্যাগ করার পর স্বদেশপ্রেম বা উগ্র স্বদেশিকতার অন্ধ নেশায় মানুষের সমগ্র জীবন আচ্ছন্ন হওয়াই অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহাই ভৌগোলিক (অঞ্চলভিত্তিক) জাতীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে এবং প্রত্যেকটি ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি ও রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়াছে। ইহারা নিজেদের দেশকে বসাইয়াছে ঠিক আল্লাহ্র স্থানে। দেশরক্ষার জন্য জান-মাল, দ্বীন-ধর্ম ও নৈতিক মূল্যমান—এক কথায় সব কিছু বিসর্জন দিতেও তাহারা প্রস্তুত হইতেছে। আল্লামা ইকবাল এই ধরনের স্বদেশিকতায় আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ইহাকে ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এক মতাদর্শ—আর ধর্মের পরিভাষায় ইহাকে একটি 'নবসৃষ্ট দেবতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে না পারিলে দ্বীন ও ধর্মের ধ্বংস অনিবার্য বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

اس دورمیس مئے اورهے جام اورهے جم اور
ساقی نے بناکی روش لطف وکرم اور
مسلم نے بهی تعمیر کیا اپنا حرم اور
تہذیب کے ازرنے ترشوائے صنم اور
ان تازه خداؤں میں بڑاست سے وطن هے
جوپیراهن اس کاهے وه مذهب کاکفن هے
یه بت که تراشیده تہذیب نوی هے
غارت گر کاشانه دین نبوی هے
بازو ترا تو حید کی قوت سے قوی هے
اسلام تراد یس هے تو مصطفوی هے
نظاره دیرینه زمانے کو دکهاد ے
اے مصطفوی خاك میں اس بت کو ملاد ے

এ যুগের সুরা, পানপাত্র, সুরাপায়ী
সব কিছুই নতুন,
সাকী উদ্ভাবন করেছে প্রেম ও জ্বালার নতুন ধরন।
মুসলিম তৈরী করে নিয়েছে
নতুন হেরেম
সভ্যতার মূর্তি নির্মাতা গড়ে তুলেছে নতুন মূর্তি।
এসব নব সৃষ্ট উপাস্যের মধ্যে
সবার বড়ো ওয়াতন—
তার যা দেহাবরণ,
তা' হচ্ছে ধর্মের কাফন।
যে মূর্তি গড়ে তুলেছে এ নতুন সভ্যতা,
ধ্বংস করছে সে 'দ্বীনে নববী'র আগার।
বাহু তোমার বলিষ্ঠ তওহীদের শক্তিতে,
ইসলাম তোমার দেশ।
আর তুমি হচ্ছো মুস্তাফার অনুসারী।
হে মুস্তাফার অনুসারী,
চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দাও
এ তুন যুগের চোখে,
এ মূর্তির আবর্জনা মিলিয়ে দাও
মাটির সাথে।

ইকবাল স্বদেশিকতাবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা মানুষের মধ্যে এক কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করে বলিয়া ইহার এক নাম 'মূর্তিপূজা'। ইকবাল বলেন, মানুষ মূর্তি রচনা ও মূর্তি পূজায় এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার একটি চূর্ণ হইলে নূতন করিয়া আর একটি রচনা করে ও উহার পূজায় নূতন উদ্যমে লিপ্ত হয়। নিত্য নূতন 'মূর্তি রচনা' ও মূর্তি পূজার এই ধারা আদিকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এই 'মূর্তি' গুলির বাহ্যিক রূপ ও আকার-আকৃতিতে কিছুটা বৈষম্য থাকিলেও মূলত উহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। অতএব মানবতার মুক্তি বিধানের অভিযানে যেখানে অসংখ্য বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইয়াছে, সেখানে স্বদেশিকতার এই নবতর বিগ্রহকেও অনতিবিলম্বে চূর্ণ করা মানবের মানসিক মুক্তির জন্যে অপরিহার্য।

اے کہ خور دستی زمینا ئے خلیل
گرمی خونت زصہبا ئے خابل
برسر ایں باطل حق پیر ہن
تیغ لاموجود الا ھو یزن

পান করেছো তুমি খলিলের জাম থেকে,
তপ্ত হয়েছে তোমার শোনিত
তারই সুরা রসে;
আঘাত করো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র তরবারি দ্বারা
অসত্যের মস্তকে।

ইকবাল স্বদেশিকতা ও সংকীর্ণ অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্যে বিশ্বমানবকে উদাত্ত আহ্‌বান জানাইয়াছেন। ইসলাম একদিকে যেমন বর্ণ, গোত্র ও বংশীয় আভিজাত্যকে নিস্তনাবুদ করিয়াছে অপরদিকে স্বদেশিকতার বিগ্রহকেও চুরমার করিয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, মানুষ যে ভূখণ্ডে বসবাস করে, উহার সহিত তাহার আন্তরিক সম্পর্ক ও টান থাকা অতি স্বাভাবিক, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, মানুষের পবিত্র আত্মা ও হৃদয়-মন স্বদেশের মৃত্তিকার সংকীর্ণ খাঁচায় এমনভাবে বন্দী হইবে যে, উহার স্বাভাবিক ও মানসিক মুক্ত পক্ষ সংকুচিত হইয়া পড়িবে। ইকবাল ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

یہی مقصود فطرت ہے ، یہی رمز مسلمانی
اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی
بتاں رنگ وخون کو توڑکر ملت میں گم ہوجا
نہ تورانی ھے باقی نہ ایرانی ، نہ افغانی

ভ্রাতৃত্বের বিশ্ব-ব্যাপকতা, প্রেম প্রাচুর্য
এই হচ্ছে প্রকৃতির চাহিদা
আর মুসলমানীর মূলতত্ত্ব।
বর্ণ ও রক্তের গড়া মূর্তিকে বিচূর্ণ কর;
আত্মবিলোপ কর মিল্লাতের মাঝে,
তোমার পরিচয় হবে না
তুরানী, ইরানী বা আফগানী বলে।

ইকবালের মতে এই আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষবিষাক্ত-স্বদেশিকতা বাদেরই পরিণতি হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ। স্বদেশিক জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক শ্লোগান দিয়া থাকেন— My country, Right or wrong"

ইকবাল মনে করেন, এই হিংসাত্মক ও অন্ধ স্বদেশপ্রীতি মানুষকে কোন দিনই হক ও বাতিল—ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার সুযোগ দেয় না। আর মানুষ যদি এই মহান গুণ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে কোন দুষ্কৃতিই আর তাহার সাধ্যাতীত থাকে না।

কোন ভৌগোলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করিয়া অঞ্চলভিত্তিক জাতি গঠন করাও ইকবালের দৃষ্টিতে মারাত্মক ভুল। এইজন্য তিনি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতি গঠন আদৌ সমর্থন করিতে পারেন নাই। বরং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক মওলানা মাদানীর তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। বস্তুত ইকবালের এই সম্পর্কীয় যাবতীয় চিন্তাধারা ইসলামী সমাজদর্শনের মৌলিক ভাবধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম স্বদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে বন্দী হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাক, ইকবাল তাহা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। কেননা ইকবালের রাষ্ট্রদর্শন কুরআনের বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদের উপর স্থাপিত।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের অভিমত এতই সুস্পষ্ট যে, সে বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয়। যে জাতীয়তার ভিত্তি দেশ, বর্ণ, গোত্র এবং ভাষার ঐক্যের উপর স্থাপিত, ইকবাল এই ধরনের জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী। রেনানের উক্তি "ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী" মোটেই সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও বংশ-বর্ণ-অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাই হইতেছে পরস্পর বিপরীত। ইকবাল নিজেই একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—আমি যখনই অনুভব করিয়াছি যে, দেশ ও গোত্রের বৈষম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত জাতীয়তাবাদ ইসলামী দুনিয়াকেও কালো রাহুর ন্যায় গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, আর যখনই দেখিয়াছি যে, মুসলিম জনগণ স্বকীয় বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ পরিহার করিয়া সংকীর্ণ স্বদেশিকতা ও জাতীয়তার দুশ্চেদ্য জালে ক্রমশ জড়িত হইয়া পড়িতেছে, তখনই একজন মুসলিম—তদুপরি একজন মানব প্রেমিক হিসেবে মানবতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তাহাদের সঠিক দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করিয়া তোলা আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। ইহা অনস্বীকার্য যে, সমষ্টিগত জীবনের ক্রমবিবর্তন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বংশ ও জাতীয়তার একটা স্থান রহিয়াছে, আর উহাকে ঠিক অতটুকু মর্যাদায় ও পরিসীমায় স্বীকার করা হইলে আমি তাহার বিরোধিতা করিতে পারিতাম না। কিন্তু উহাকেই যদি মানবীয় কাফেলার এই মহাযাত্রার শেষ মন্‌যিল রূপে নির্ধারণ করা হয়, তবে তাহাকে নিকৃষ্টতম অভিশাপ মনে করিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হইবে না।

এই স্বদেশিকতা ও জাতীয়তা সম্পর্কে ইকবালের বিস্তারিত অভিমত জানিবার জন্যে আমরা তাঁহার বিরাট কাব্যের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইকবাল কাব্য পাঠে উপলব্ধি করা যায় যে, ইকবাল জাতীয়তাবাদের প্রচলিত ধারণার প্রকাশ্য বিরোধিতা করিয়াছেন এবং বিশ্বের সার্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষকে এই অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করার জন্যে আহবান জানাইয়াছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے
تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے
خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے
اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اسی سے
قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے

এরই ফলে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব
বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে
বিশ্বজয়ই লক্ষ্য হয়ে উঠে
ব্যবসা বাণিজ্যের;
এরই ফলে রাজনীতি হয়
ন্যায়নীতির সম্পর্ক বর্জিত,
দুর্বলের সংসার হয় বিপর্যস্ত
এরই প্রভাবে।
জাতীয়তাবাদ বিচ্ছিন্ন করে দেয়
মানব ঐক্যের বন্ধন,
ইসলামী কাওমিয়াতের
বন্ধন হয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

জাতীয়তাবাদের বাহ্যিক আবরণ খুবই মনোমুগ্ধকর বটে; কিন্তু ইউরোপীয় জাতিসমূহের লালসা ও পররাজ্য লোলুপতা এবং জাতীয়তাবাদী দেশসমূহের ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা কোন অনুভূতিশীল অন্তরের কাছে সহনীয় হইতে পারে না। ইকবাল জাতীয়তাবাদের মূল উৎস ও প্রধান কেন্দ্রকে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া মর্মান্তিকভাবে হতাশ হইয়াছেন। ফলে অবিলম্বে তাঁহার দৃষ্টি এক উন্নততর ও মহত্তর আদর্শ—ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ইসলামী আদর্শভিত্তিক জাতীয়তায়ই বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাই তাঁহার কাব্যে এক দিকে যেমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র প্রতিবাদ এবং উহার প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, তেমনি অপর দিকে রহিয়াছে ইসলামী জাতীয়তার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস এবং উহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। 'রমুজে বেখুদী' গ্রন্থের ১২৯-৩০ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

قلب ماаз هند و روم وشام نیست
مرزو بوم او بجز اسلام نیست
مسلم استی دل باقلیمے مند
گم مشو اندر جهان چوں وچند
دل بد ست آورکه پنها ئے دل
من شود گم ابن سرائے آت گل
ازرسالت در جهاں تکوین ما
ازرسالت دین ما ایمان ما

অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া;
মুসলিম তুমি–
আবদ্ধ করো না তোমার অন্তর
কোন দেশের বন্ধনে,
হারিয়ে ফেলো না তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে;
জয় কর অন্তর,
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্মবিলুপ্ত হতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থ নিবাস।
নবুয়তের ভিত্তিতে কায়েম হয়েছে
আমার অস্তিত্ব দুনিয়ার বুকে,
নবুয়তের ভিতরেই নিহিত রয়েছে
আমার দ্বীন ও ঈমান।

ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যাহারা ইসলামের বিশ্ব ব্যাপকতা ও মহান মানবভ্রাতৃত্বের মতবাদ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার এই জাতীয়তাবাদের বিরোধিতার ব্যাপারে ইকবালকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যাদর্শী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ এই জাতীয়তাবাদ এমন এক

মারাত্মক থিওরী, যাহার নির্মম নিস্পেষণ ও মানবতার চরম নির্যাতনে জাতীয়তাবাদের পাদপিঠ ইউরোপই আজ অতিষ্ঠ হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। আর এই স্বদেশিকতা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের দুঃসহ বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভের জন্যে আজ তাহারা সর্বজাতি-সম্মেলন-পরিকল্পনার আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইউরোপীয় জাতিকে ইকবাল নিতান্ত অন্ধ জাতীয়তাবাদী বলিয়া মনে করেন। এইজন্য অধুনা নিত্য অনুষ্ঠিত সর্বজাতি সম্মেলনে তাহাদের বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা ও সদুদ্দেশ্য থাকিতে পারে, একথাও তিনি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই তিনি জাতিসংঘকে পরিষ্কার ভাষায় 'কাফনচোর' আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার একান্ত বিশ্বাস, এখানেও ঠিক ইউরোপীয় জাতিসমূহের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বজয়ের চির পুরাতন কুটিল ষড়যন্ত্রই কাজ করিতেছে। এখানেও 'সর্বজাতি সম্মলনে'ই প্রধান—'মানব সম্মেলনের' কোন গুরুত্ব বা মর্যাদাই এখানে নাই। কিন্তু ইহারই বিরুদ্ধে মানবপ্রেমিক ইকবাল আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। অধুনাবিলুপ্ত 'লীগ অব্ নেশন্স' সম্পর্কে ইকবালের আশংকা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। লীগ তাহার অস্থায়ী জীবনে দুর্বল জাতিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে মোটেই সমর্থ হয় নাই এবং নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) প্রচেষ্টা রিমজে মেয়রের কথানুযায়ী (Armament) সশস্ত্রীকরণ-এ পরিণত হইয়াছে। ইহারই ফলে পৃথিবীর উপর দিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ংকর তাণ্ডবনৃত্য ঘটিয়া গেল। 'লীগ অব্ নেশন্স'-এর মর্মান্তিক পরিণতি ইকবালের জীবদ্দশায়ই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সর্বশেষে এইসব দুরারোগ্য ব্যাধির কারণেই 'লীগ' জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ইহারই দিকে ইশারা করিয়া আল্লামা ইকবাল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঃ

بیچاری کئی روزسے دم توڑ رهی هے
ڈرهے خبر بد نه میر ے منه سے نکل جائے
تقدیر تو مبرم نظر آتی هے ولیکن
پیر ان کایسا کی دعاهے که ٹل جائے

কিছুকাল ধরে বেচারার
নাভিশ্বাস উঠে গেছে,
ভয় হয়, আমারই মুখ থেকে
বেরিয়ে না পড়ে দুঃসংবাদ!

নিয়তি তার মনে হয়
অবধারিত,
যদিও গীর্জার যাজকরা
করে চলেছে তার শুভ কামনা।

এক শ্রেণীর লোক ইকবালকে এই তথাকথিত জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিতে দেখিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহে যে, ইকবাল স্বদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। তাহাদের এই কথায় আমরা যুগপৎ হাসি ও কান্নায় ম্রিয়মান হইয়া পড়ি। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলিতে পারি, তাহারা ইকবালের চিন্তাধারাকে মোটেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই, এমনকি তাহারা ইকবালের মতবাদ ও চিন্তাধারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ দিয়া গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেও চেষ্টা করে নাই এবং এই জন্যেই তাহারা মরহুমের প্রতি এতবড় অবিচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইকবাল মাতৃভূমির স্বাধীনতার বিরোধী কিংবা গোলামীর পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই যে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন, এই কথা কেবল অর্বাচিন ব্যক্তিরাই বলিতে পারে। এই বিরোধিতার মূল কারণ কি ছিল সে সম্পর্কে আমরা 'আদর্শ সমাজ' প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে ব্যক্তি জীবন ভরিয়া সকল মানুষ ও মিল্লাতকে 'খুদী'র (আত্মদর্শন) পাঠ শিক্ষা দিলেন, যিনি 'বন্দেগীনামা' রচনা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, দাসত্ব ও সত্যিকার আযাদীর জীবন দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী জিনিস, যিনি সমগ্র মানব জাতিকে সাধারণ আযাদী, সাধারণ ভ্রাতৃত্ব, সাধারণ বিচার-ইনসাফ এবং কষ্টসহিষ্ণুতার অভিনব পয়গাম শোনাইলেন, যিনি 'পাস্‌চে-বায়েদ কর্দ' 'জরবে কলীম' এবং 'বালে জিব্‌রীল' প্রভৃতি গ্রন্থে পাক-ভারতের গোলমী এবং ইহার অধিবাসীদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ ও ঐক্যহীনতার দুঃখে অবারিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন, সেই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কি করিয়া মানুষ এই মত পোষণ করিতে পারে যে, রুশোর মতে যে স্বাধীনতার পিপাসা একটি ক্ষুদ্র পোকা-মাকড়ের মধ্যেও বিদ্যমান এবং যাহা ব্যতীত কোন চরিত্রই পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না—অতটুকু স্বাধীনতার স্পৃহাও ইকবালের হৃদয়ে ছিল না? বস্তুত ইকবাল যে আত্মশক্তির জয়গান গাহিয়াছেন, প্রকৃত স্বাধীনতার উন্মাদনা প্রত্যেকটি মানুষের মর্মমূলে— প্রত্যেকের প্রতি রক্তবিন্দুতে ছড়াইয়া মিশাইয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিরাট কাব্য গভীরভাবে অধ্যয়ন না করিলে

কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়। আমরা এই শ্রেণীর মানুষকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও কূপমন্ডুকতা পরিহার করিয়া উন্মুক্ত হৃদয়-মন লইয়া ইকবাল-সাহিত্য অনুশীলন করিতে অনুরোধ জানাই। এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিলে তাহাদের হৃদয়দুয়ার উন্মুক্ত হইবে; প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহার সম্যক পরিচয় তাহারা লাভ করিতে পারিবে।

বস্তুত ইকবাল প্রকৃত আযাদীর মোটেই বিরোধী ছিলেন না, থাকিতে পারে না। তিনি মনে করেন, আযাদী শুধু "মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার" জন্যেই নয়, 'খুদী'র ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের জন্যেও ইহা অপরিহার্য। গোলামীর হীন ও সংকীর্ণ জীবন মানবতার মর্মান্তিক অবমাননা। ইকবাল নিজে একজন স্বাধীনচেতা মানুষ তাই পৃথিবীর সকল মানুষকেও তিনি 'পূর্ণ স্বাধীন' দেখিতে চাহেন। তিনি মনে করেন আযাদীর মুক্ত বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিলে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না। পরাধীন ও পরপদানত মানুষের প্রতি তিনি কিছু মাত্র আশা-ভরসা পোষণ করেন না।

بهروسه کربهین سکتے غلاموں کی بصیرت پر
که دنیا میں فقط مردان حرکی آنکه هے بینا

নির্ভরযোগ্য নয় গোলামের বিচক্ষণতা,
স্বাধীন মানুষের চক্ষুই হচ্ছে দুনিয়ার সত্যদ্রষ্টা।

আসল কথা, ইকবাল ছিলেন বিশ্বজনীন ও বিশ্বপ্রেমিক মানুষ। এই জন্যে বিশ্বজনীনতার বিরোধী সকল মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। আশাবাদী কবি ইকবাল প্রাচ্যদেশের জাতি সম্মেলন সফল হইবে বলিয়া মনে করেন, কারণ প্রাচ্য জাতি পংকিল সওদাগরী বুদ্ধি ও লোভ-লালসাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। কখনও কখনও তিনি মুসলিম জাতিপুঞ্জের নিকঠ ঐক্য সংস্থাপনের জন্য আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন এবং দেশ ও গোত্রবিরোধ দূরীভূত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব-মূলক আদর্শবাদকে একমাত্র মুসলিম জনগণই বাস্তব রূপ দান করিতে সক্ষম। অন্যান্য জাতি জাতীয়তাবাদের তীব্র নেশায় এতদূর উন্মাদ ও দিশেহারা হইয়া ছুটিয়াছে যে, এই বিশ্বজনীনতার আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া

তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত কথা এই যে, ইকবাল মানুষকে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী দেখিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। এইজন্যেই তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে আন্তর্জাতিকতার উপর। বস্তুত ইকবালের প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা বড় পাপ আর কিছুই হইতে পারে না। ইকবালের দৃষ্টিতে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতা ইসলামের বিশ্বব্যাপক ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ১৯৩৮ সনে এক প্রবন্ধে তিনি স্বদেশিকতার দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া স্পষ্ট ভাষায় উহাকে ইসলামের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

زمانه کے سیاسی لٹر یجر میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ "وطن" ایك اصول هے هئیت اجتماعیه انسانیه کا اور اسی اعتبارسے یه ایك سیاسی تصورهے، چونکه اسلام بهی هیئت اجتما عیه انسانیه کاایك قانون هے اسلئے جب لفظ وطن کو ایك سیاس تصور پراسنعمال کیا جائے تووه اسلام سے متصادم هوتاهے -

আধুনিক যুগের সাহিত্যে ‘ওয়াতন’ (স্বদেশ) নিছক কোন ভৌগোলিক অর্থেরই ধারক নহে; ‘ওয়াতন’ হইতেছে মানবীয় সমাজ সংগঠনের একটি বিশেষ আদর্শ এবং এই হিসাবে ইহা একটি রাজনৈতিক মতাদর্শও বটে। যেহেতু ইসলামও মানবীয় সমাজ সংগঠনেরই একটি বিধান, তাই ‘ওয়াতন’ বা স্বদেশ শব্দটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহৃত হইলে উহা নিশ্চিতরূপে ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইবে।

ইউরোপের গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী সম্পর্কে ইকবাল কখনও অনুকূল মত পোষণ করেন নাই। তাঁহার মতে এই গণতন্ত্রও স্বৈরাচার, সাম্রাজ্যবাদ ও সাধারণ পরাধীনতা প্রতিষ্ঠার একটি অভিনব উপায়মাত্র। ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে ফরাসী গণতন্ত্র ও বৃটিশ গণতন্ত্র পেশ করা যাইতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের সময় জাতি জিন্দাবাদের যে ধ্বনি দ্বারা অসহায় মানুষকে জাগ্রত করা হইয়াছিল, পরবর্তীকালে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বিস্তার, পররাজ্য অধিকার ও অন্যান্য জাতিকে গোলাম করিবার সময়ও ঠিক অনুরূপ শ্লোগানই ব্যবহার করা হইয়াছে। বস্তুত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মানুষকে শুধু গোলামই বানাইয়াছে, গোলামী হইতে মুক্তি দিতে সমর্থ হয় নাই। সর্বোপরি মানবতার যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জীবনের গতিপথে দিক নির্ণয় করে উহাকে সংখ্যাধিক্যের ভোটের অধীন করিয়া দেওয়া নিঃসন্দেহে মানবতার চরম অবমাননা। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, উহা মানুষকে গণনা করিতে জানে বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও মস্তিষ্কের ওজন করিতে ইহা মোটেই প্রস্তুত নয়। অথচ এই 'ওজন করা' ছাড়া সম্মিলিত সমাজ ব্যবস্থায় সুবিচার ও সুশৃংখলা স্থাপিত করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। 'জরবে কলীম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ঃ

جمہوریت ایک طرزحکومت ھے کہ جسمیں
بندوں کوگنا کرتے ھیں تولانہیں کرتے

গণতন্ত্র এমন এক শাসনপ্রণালী
যেখানে মানুষকে গণনাই করা হয়,
পরিমাপ করা হয় না
তাদের মস্তিষ্কের।

নীতি হিসাবে ইকবাল মূল রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে জনসাধারণকে প্রবেশাধিকার দানের আদৌ পক্ষপাতী নহেন। কারণ, তাঁহার মতে প্রত্যেকটি সাধারণ ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম ও জটিল রাষ্ট্রনীতি বুঝিবার মতো বুদ্ধি ও প্রতিভা দান করেন নাই। তিনি 'খিলাফতে ইসলামীয়া' সম্পর্কে যে পুস্তিকা

রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নির্বাচন প্রথাকে এক প্রকার সমর্থনই করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, পরবর্তীকালে তাঁহার এই মতে ধীরে ধীরে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। তিনি আসলে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনের জন্যে একজন পূর্ণ ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের (Self centred perosnality) আবশ্যকতা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন। নিট্শের মতো তিনিও এক জীবন্ত ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিট্শের 'নেতা' বস্তুভিত্তিক শক্তি ও বর্বরতার প্রতীক, আর ইকবালের 'ইমাম' বস্তুভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার শক্তিরই পূর্ণ সমন্বয়। 'পয়ামে মাশরিক' গ্রন্থে কবি বলেন ঃ

متاع معنی بیگانه از دون فطر تان جوئی
زموران شوخی طبع سلیمانی نمی آید
گریز از طرز جمهوری غلام پخته کار لے شو
که ازمغز دوصد خر فکر انسانی نمی آید

সন্ধান করছো অজানা ভাবসম্পদ
নীচস্বভাব মানুষের কাছে,
সম্ভব নয় সোলাইমানের মহত্ত্ব প্রকাশ
পিপীলিকার পক্ষে।
বর্জন কর গণতন্ত্র আর আনুগত্য কর
জ্ঞানবুদ্ধ কর্মীর;
দুশো গর্দভের মস্তক
জন্ম দিতে পারে না
একটিমাত্র মানুষের জ্ঞান।

রুশো যদিও এমন গণতন্ত্রের পক্ষপাতি ছিলেন, যাহাতে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যই মূল ভিত্তিস্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি গণতন্ত্রের মৌলিক দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদা সচেতন। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, এই ধরনের শাসনপদ্ধতি কেবল ফেরেশতাদের জগতেই শোভা পায়। আমরা তো মানুষ, আমরা ইহার মোটেই যোগ্য নহি। এক্ষণে খোদ ইউরোপেও এই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচারিত হইতেছে এবং ইহার অভ্যন্তরীণ ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এই শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে ইকবালের সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, ইহাতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি যোগ্যতা নয়— বরং জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধিই হইতেছে ইহার একমাত্র মানদণ্ড। অথচ এক ব্যক্তি যোগ্যতা ছাড়াও জনগণের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে। ইহার উপর ইকবালের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, গণতন্ত্র দলাদলি ও বিভিন্ন দলের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে এবং উহাকে ক্রমশ উত্তেজিত করিয়া মারাত্মক রূপ দান করে। অধ্যাপক লাস্কী গণতন্ত্রের সংখ্যাতীত সৌন্দর্য স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তবুও তিনি গণতন্ত্রের মধ্যে এই ভীষণ আশংকা বোধ করেন যে, রাষ্ট্র ও দেশ শাসনের ব্যাপারে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশ ও ভোটাধিকার জাতির মধ্যে অসংখ্য পরস্পর বিরোধী দল সৃষ্টির কারণ হইতে পারে। গণস্বাধীনতার বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণের আধিপত্য ও ইচ্ছা প্রয়োগের এই অবাধ সুযোগ কোন শাসনব্যবস্থাকেই দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকিতে দেয় না এবং প্রতিদিন নূতন নূতন বিদ্রোহ-বিপ্লব, দ্রুত পরিবর্তনশীল অসংখ্য ঘটনা ও ক্ষমতার তড়িৎ হস্তান্তর জাতীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়নের পথে কঠিন বাধার সৃষ্টি করে। 'গুলশানে রাজ' গ্রন্থে এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকেই ইকবাল ইশারা করিয়াছেন ঃ

فرنگ آئین جمهوری نهاد است
رسن ازگردن دیوی نهاد است
گروهے راگرو هے درکمین است
خدایش یاراگر کارش چنین است
چون رهزن کاروانے درتگ وتاز
شکمها بهر نانے درتگ وتاز
زمن ده اهل مغرب را پیامے
که جمهور است تیغ بے نیامے

পশ্চিমী জাতি খুলে দিয়েছে
শয়তানের গলায় রজ্জু
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা,
বিভিন্ন দল লিপ্ত হয়েছে

পারস্পরিক কলহে।
খোদা রক্ষা করুন আমাদেরকে
তাদের কার্যকলাপ থেকে
মানুষের কাফেলা আজ সংগ্রামরত
পথদস্যুর মতো;
এক টুকরা রুটির জন্যে লিপ্ত তারা
পারস্পরিক দ্বন্দ্বে।
শুনিয়ে দাও আমার পয়গাম
পশ্চিমী জাতিকে
গণতন্ত্র হচ্ছে এক নাংগা তলোয়ার!

এই পংক্তিগুলির সঙ্গে 'খিজ্‌রেরাহ' গ্রন্থের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ

ہےوہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام
جس کے پردلے مین نہیں غیراز نوائے قیصری
دیو استبداد جمہوری قبا مین پائے کوب
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی نیلم پری

পশ্চিমী গণতন্ত্রের সেই প্রাচীন ভেরী–
ধ্বনিত হয় যাতে
সাম্রাজ্যবাদের সুর,
স্বৈরাচার দৈত্যের তাণ্ডবনৃত্য চলছে
গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে,
তাকেই তুমি মনে কর
আযাদীর নীলপরি।

বস্তুত যেসব পরাধীন জাতির উপর গণতন্ত্রের অনুগ্রহ (?) বর্ষিত হইয়াছে, সেসব দেশেই মানুষ পিজঁরাবদ্ধ কুসুমের ন্যায় শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

'আর্‌মগানের হিজাজ' গ্রন্থে 'ইবলীসের পরামর্শসভা' শীর্ষক যে কবিতা লিখিত হয়েছে, তাহাতে কবি পাশ্চাত্য দেশের গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিকে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ পীড়নের একটা প্রধান হাতিয়ার বলিয়া ঘোষণা

করিয়াছেন। এই শাসনপদ্ধতির বাহ্যিক আকৃতি যদিও উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর, তথাপি ইহার অভ্যন্তর চেংগীজের অপেক্ষাও ভীষণ কুৎসিত ও বীভৎস। আল্লামা ইকবাল তাঁহার শেষ জীবনের রচনাবলীতে গণতন্ত্রের দোষত্রুটি সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর সমালোচনার অবতারণা করিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে সেই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ, বেনিয়া মনোবৃত্তি এবং স্বৈরাচার ইহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রহিয়াছে।

'কাইজার উইলিয়াম এবং লেনিনের কথোপকথন'-এ এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, সমস্ত মানব-প্রকৃতি শুধু পরাক্রমশালী ও শক্তিমান অত্যাচারী ব্যক্তিত্বের সম্মুখেই মস্তক অবনমিত করিতে বাধ্য হয়। স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রসমূহে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়ও ঠিক তাহাই বিদ্যমান। .... ইহাদের মধ্যে মূলত পার্থক্য কিছুই নাই।

উপরন্তু পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র সঠিকরূপে কোথায়ও বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই। প্লেটো যে গণতন্ত্রের পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহা একটি মধুর কল্পনাই মাত্র, বাস্তবের সহিত উহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। সাম্য নিয়মতন্ত্র ও ভ্রাতৃত্বের যত শ্লোগান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে শোনা গিয়াছে, তাহা সবই দুর্বল লোকদের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি মাত্র। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ফরাসী বিপ্লব নানাবিধ চিত্তাকর্ষক দাবির শ্লোগান এবং লোভনীয় নীতি ও আদর্শের ঘোষণা সহকারেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্ববাসী দেখিতে পাইল যে, গণতন্ত্র, নিয়মতন্ত্র ও আদর্শবাদিতার সেই শ্লোগান কর্পূরের মতো যেন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

ইকবালের মতে গণতন্ত্র কোন উৎকৃষ্ট নির্ভুল রাষ্ট্রব্যবস্থা নহে; বরং উহার সাহায্যে সাধারণত অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিরাই ক্ষমতা লাভ করে, অনুপযুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ সমাজক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। ইহারই জন্যে গণতন্ত্রের অধীন যে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠে, তাহা কখনো উন্নত সুন্দর ও ত্রুটিহীন হইতে পারে না।

রুশো লিখিয়াছেন ঃ দুনিয়ায় কোন গণতন্ত্রই আজ পর্যন্ত কখনো বাস্তবায়িত হয় নাই, তাহা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবও নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন করিবে ও সংখ্যালঘিষ্ঠগণ শাসিত হইবে, ইহা গণতন্ত্রের নিয়ম

হইলেও ইহা স্বভাবনিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যত গৃহযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও দলীয় কোন্দল সৃষ্টির আশংকা রহিয়াছে, তত আর কোন শাসনব্যবস্থায়ই বর্তমান নাই।

রুশোর মতে প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি হইতেছে সততা ও পূণ্য। ইকবাল এই ব্যাপারে রুশোর মতবাদ সমর্থন করেন কেননা প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইতেছে খোদায়ী ব্যবস্থার বাস্তব দাবি। বর্তমান ইউরোপের রাজনীতি ও তমদ্দুন যেসব নৈতিকতা বিবর্জিত নিয়ম-বিধানের উপর স্থাপিত, ইকবাল তাহা আদৌ সমর্থন করেন না। তিনি বিশ্বের মানুষকে উহার ফাঁকি ও প্রতারণা হইতে দূরে থাকিতে ও উহার প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন এবং প্রেম, ভালবাসা, জনসেবা, সুদৃঢ় ঈমান ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা বিশ্বজয় করার 'সবক' শিক্ষা দিয়াছেন।

ولایت پادشاهی هو، علم اشیا کی جهانگیری
یه سب کیاهیں فقط اك نقطه ایمان کی تفسیرین
یقین محکم، عمل پیهم، محبت فاتح عالم
جهاد زندگانی میں یه هیں مردوں کی شمشیریں

বাদশাহীর ঐশ্বর্য আর বস্তুবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি –
সব কিছুই হচ্ছে ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি।
সুদৃঢ় প্রত্যয়, অবিরাম কর্মচঞ্চলতা
আর বিশ্ববিজয়ী প্রেম –
এই হচ্ছে শানিত কৃপাণ
জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে।

বস্তুত আজ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের পক্ষে ঠিক এই জিনিসেরই প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। আর যত দিন পর্যন্ত ইউরোপ এই জিনিস গ্রহণ না করিবে, ততদিন সর্বব্যাপী ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া উহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এক হিসেবে নিছক অর্থনৈতিক ব্যাপার হইলেও রাজনীতির সাথে উহার নিবিড় ও নিকটতম সম্পর্ক বিদ্যমান। এইজন্যে ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও পাঠকদের সম্মুখে পরিস্ফুট করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করি।

জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানুষের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তাহাই জীবনের অন্যান্য সমগ্র দিক ও বিভাগেও অনিবার্য রূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইকবালের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর তাই তাঁহার মৌলিক জীবনদর্শন ও বিশ্বদর্শনের গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। যেহেতু ইকবাল 'খুদী' প্রতিষ্ঠা ও আযাদী সংগ্রামের অগ্রনায়ক, তাই তাঁহার অর্থনৈতিক চিন্তাধারায়ও ইহার প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। 'খুদী' প্রতিষ্ঠার নীতির সহিত ব্যক্তিতন্ত্রের গভীর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ইকবাল যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিরংকুশ ব্যক্তিবাদের প্রশ্রয় দেওয়ার ধারণা সমর্থন করিতেন, তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। তিনি পুঁজিবাদী অর্থনীতি আদৌ সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইকবালের মনে পুঁজিবাদ বিশ্বের ' ক্ষে এইজন্য মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছে যে, উহাতে নৈতিক ও মানবীয় ভাবধারার বিন্দুমাত্র স্থান নাই। ইহা মানুষকে নিছক ইতর জন্তু-জানোয়ারের সমপাংক্তেয় মনে করে। যথেচ্ছ উদর পূর্তির জন্যে খাদ্য গ্রহণ, অন্য কথায় দুই হাতে নির্বিচারের অর্থ লুণ্ঠন ছাড়া তাহার জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না— ইহাই পুঁজিবাদের ধারণা। এই কারণে বিশেষ করিয়া জনগণের জীবনে এক মহাশূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বলিতে তাহাদের জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তাহাদের চেষ্টা ও সাধনায় কোন ত্রুটি নাই; কিন্তু লক্ষ্যহীন তীর নিক্ষেপে কোন ফলই ফলিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুত নৈতিক বিধান এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও চেষ্টা সাধনা সাম স্যপূর্ণ না হইলে জীবনে কখনও স্থিতি ও শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি এই যে, বিরাট সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকই ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকার লাভ করে। আর সমাজের অবশিষ্ট অংশ শুধু আশার মরীচিকার

পশ্চাতে ধাবিত হইতে বাধ্য হয়। সেখানে অধিকাংশ লোকের চেষ্টাসাধনা বিক্ষিপ্ত, শর্তহীন এবং যান্ত্রিক; জনগণ তথায় এক সাধারণ নৈরাশ্যের মধ্যেই দিন যাপন করিতে বাধ্য হয়। এক কথায় পুঁজিবাদী সমাজে এক দল হয় মনিব মহাজন— যাবতীয় ধন-সম্পদের একচ্ছত্র অধিপতি, অবশিষ্ট লোক হয় দরিদ্র নিঃস্ব এবং দাসানুদাস। ইকবাল ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

تمیز بندہ واقا فساد آد میت ہے
حذرالے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

প্রভু ও দাসের পার্থক্য
ধ্বংস করে মনুষ্যত্বকে,
হে ঘাতক! সাবধান হও
প্রকৃতির ভয়াবহ প্রতিশোধ থেকে।

'কমিউনিজম' সম্পর্কে ইকবালের মতবাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কার্লমার্কস মজুর শ্রমিকদের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সাম্য ও শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ইহার বাস্তব রূপায়ণ হইয়াছে রাশিয়ায় লেনিনের প্রচেষ্টায়। এই আর্থিক সাম্যের আন্দোলন নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের নির্মম নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। কাজেই ইহার সাথে বুদ্ধি ও সদিচ্ছার যোগ যতখানি না হইয়াছে, তাহার অধিক হইয়াছে প্রতিহিংসামূলক আক্রোশের প্রয়োগ। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত রোগের চিকিৎসা হয় নাই, বরং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে তাহা আরো অসংখ্য জটিল সমস্যার জন্মদান করিয়াছে। ইকবাল বলেন ঃ কমিউনিজমের নীতি অনুসারে মজুর শ্রমিক— এক কথায় মেহনতী জনতার হাতেই যদি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও তমদ্দুনিক জীবনের সমস্ত চাবি-কাঠি অর্পণ করা হয়, তবে 'পাথর কাটার পথে অচিরেই চিলের ছোঁমারার' মতো কুটিল ষড়যন্ত্রমূলক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়া পড়িবে। আর ইহার সাথে সাথে এমন সব অনাচার ও দুর্নীতি শুরু হইয়া যাইবে, যাহার গতিরোধ করা কাহারো পক্ষেই সম্ভব হইবে না।

زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
طریق کوهکن میں بھی وهی حیلے ہیں پرویزی

যদি মজদুরের হস্তগত হয় কর্মের কর্তৃত্ব.
তাহলে প্রকাশ পাবে
পাথর কাটার ভিতরে
আদিম স্বৈরাচার

কমিউনিজমের শিক্ষা নিছক বস্তুবাদী এবং তাহা আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু মানব জাতির পুঞ্জীভূত অতীত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিতেছে যে, উদর সাম্যের বুনিয়াদে যে বিপ্লব সাধিত হয়, তাহা কোন সুদৃঢ় ও স্থায়ী তমদ্দুনিক মূল্য (Cultural value) লাভ করিতে পারে না। তদুপরি ইহাও মানুষের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা যে, ধর্ম ও চরিত্র শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত মানব জাতির অভ্যন্তরীণ ও মানসিক পরিবর্তন সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়।

غریباں گم کردہ اند افلاك را
درشکم جویند جان پاك را
دین آں پیغمبو حق ناشئاس
برمساوات شکم دارد اساس

দরিদ্র হারিয়ে ফেলেছে তার
জীবনের লক্ষ্য,
পবিত্র জীবনের সন্ধান করে সে
উদরের মাঝে।
সত্যদৃষ্টিহীন এই 'পয়গম্বরের' জীবন বিধান
কায়েম করেছে তার বুনিয়াদ
জঠর সাম্যের উপর।

অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত চরিত্র ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ কায়েম না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা বল্গাহীন, উদ্দাম ও উচ্ছৃংখল হইতে বাধ্য। সে কার্যক্রম পুঁজিবাদী নীতি অনুসারেই হউক আর কমিউনিজমের আদর্শেই হউক, তাহাতে কিছুমাত্র পার্থক্য সূচিত হয় না। ধর্ম ও চরিত্রের দৌলতেই মানবমনের মালিন্য ও কলুষতা দূর হইয়া উহা স্বচ্ছ ও নির্মল হয় এবং মানুষ পাশবিকতার নিম্নতম স্তর হইতে মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগেও আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং ধর্ম ও চরিত্রকে 'সর্বনাশা মদের'

শামিল মনে করার মতো লজ্জাষ্কর অবৈজ্ঞানিক উক্তিও সম্ভব হইতেছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই অবৈজ্ঞানিক খামখেয়ালীই কমিউনিজমের ভিত্তিমূলকে একেবারে অন্তসারশূন্য করিয়া দিয়েছে। ইকবাল ইহার অনিবার্য ধ্বংসকারিতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিজেরও চিরবিলুপ্তি সম্পর্কে কোনই সন্দেহ পোষণ করেন না।

مغربی تہذیب اپنی آپ خود کشی کریگی
جوشاخِ نازك په آشیانه بنیگا نه پائدا رهوگا

পশ্চিমী সভ্যতার পরিণাম আত্মহত্যা,
দুর্বল শাখার উপর রচিত হয়েছে যে নীড়
স্থায়ী হতে পারে না তা কখনো।

কমিউনিস্ট সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে খাওয়া-পরার নিরাপত্তা দেয়া হয় বলিয়া প্রচার করা হয়। এই কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই যে, সেখানে প্রত্যেকটি নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট বন্দী; গণিয়া গণিয়া যে কয়টি খাদ্যকণা রাষ্ট্রের তরফ হইতে দেয়া হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়াই সকল নাগরিককে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, চিন্তা ও গতিবিধির আযাদী বলিতে কাহারো কিছুই থাকিবে না। ইকবাল এই ধরনের খাদ্যপ্রাপ্তির প্রতি অভিশাপ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اے طائر لا هوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی هو پرواز میں کوتاهی

ওগো উর্ধ্বলোকচারী পক্ষী,
মৃত্যুই কাম্য সে জীবিকার চেয়ে—
যা আড়ষ্ট করে তোমার পক্ষ
আর রুদ্ধ করে তোমার উড়ে চলা।

প্রাচ্য ও ইসলামের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি ইকবাল স্বাধীন সমালোচকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। মুসলিম সমাজকে নির্জীব, পঙ্গু ও বিলাসী করিয়া দেয় যে সাহিত্য, ইকবাল তাহার তীব্র নিন্দা করেন। পক্ষান্তরে যেসব চিন্তাশীল মনীষীর গ্রন্থ ও প্রবন্ধরাজী জাতির জীর্ণ দেহে নব জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া দেয়, তাহাদের প্রতি তাহার হৃদয়ে অনুপম ভক্তি ও শুভেচ্ছা নিহিত ছিল। তন্মধ্যে ফারসী কবি মওলানা রুমী— যাঁহার মস্‌নভী আজিও মানুষের বুকে প্রাচীন প্রেমের করুণ স্মৃতির দুঃসহ জ্বালা জাগাইয়া দেয়— ইকবালের নিকট সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির দাবিদার।

'জাবীদনামা'য় ইকবাল মওলানা রুমীকে নিজের পথপ্রদর্শক রূপে মানিয়া লইয়াছেন, যেমন করিয়া দান্তে ভার্জিলকে গ্রহণ করিয়াছেন নিজের পরিচালক হিসাবে। একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে, ইকবাল মওলানা রুমীর চিন্তাধারার দীপ্তিমান শিখা হইতে যতদূর আলো গ্রহণ করিয়াছেন, তত বেশি আর কাহারো নিকট হইতে তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংমিশ্রণের ফলেই ইকবালের পক্ষে একটা অভিনব, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের রাজপথ রচনা করা খুবই সহজ হইয়াছে। প্রাচ্য দেশের দর্শন ও অধ্যাত্মবাদকে পশ্চিমী বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে তিনি যাচাই করিয়াছেন এবং তাহার মুকাবিলায় একটা সুসমঞ্জস, সুসংবদ্ধ ও সঞ্জীবিত দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্যের পরিবর্তে প্রাচ্য ভাবধারারই প্রভাব অধিকতর প্রতিফলিত হইয়াছে। ইকবাল নিজেই বলিয়াছেন ঃ

> 'দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ইসলামী দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমার অবকাশ হইলেই আমি একখানা বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করিয়া ইউরোপীয় দার্শনিকদিগকে জানাইয়া দিতাম যে, আমাদের ও তাহাদের দর্শনের মধ্যে কত ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান।
>
> পুনরায় একস্থানে বলিয়াছেন ঃ
>
> 'আমার দর্শন প্রাচীন মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের প্রদত্ত শিক্ষার

পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা মাত্র। আরো স্বচ্ছ ভাষায় বলিতে গেলে ইহা নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে পুরাতনের ব্যাখ্যা মাত্র।

বস্তুত ইকবাল জীবনদর্শনের স্বার্থক কবি। তিনি তাঁহার কাল্পনিক সৃষ্টির মারফতে ভাবাবেগে ভারাক্রান্ত দিলকে শুধু ভারমুক্তই করেন নাই, সেই সঙ্গে তামাদ্দুনিক মূল্যমানকেও তিনি অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। যে তমদ্দুনিক জাতির সাথে তাঁহার নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহার ঐতিহ্য ও নৈতিক দায়িত্বসমূহ তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। তাঁহার সাহিত্যে ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ মৌলিকতা ছাড়া সামাজিক ভিত্তিও যথাযথরূপে বিরাজমান। কাব্য রচনা তাঁহার কোন বিলাস নহে, ইহা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। তাঁহার জীবন লক্ষ্যের মহানতা ও বিরাটত্বের কারণে তাঁহার সাহিত্য উন্নত মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। বিষয় বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই শিল্পীর শিল্প লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব। রচনা চাতুর্য নিখুঁত হওয়ার দ্বারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী কিছুই নয়।

সাহিত্য ও শিল্পকে ইকবাল মনে করেন জীবনের খিদ্‌মতগার। তাঁহার দৃষ্টিতে সার্থক কবি তিনিই হইতে পারেন, যিনি নিজের ব্যক্তিত্বের শক্তি ও প্রেমের তেজস্বীতার দ্বারা স্বীয় মন ও মগজের উপর এক অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, আর ইহাই হইতেছে শিল্পের প্রাণবন্ত। বীর্যবত্তা ও সৌন্দর্যপিপাসা উভয় ভাবধারাই এখানে পাশাপাশি বিদ্যমান। তিনি বলেনঃ

دلبری بے قاهری جادو گری است
دلبری باقاهری پیغمبری است

যে মনোজয়ের সাথে
বীর্যবত্তার নাই কোন সম্পর্ক
যাদু ক্রিয়া বলা হয় তাকে,
যে মন আকর্ষণের সহিত
যোগ হয় বীর্যবত্তার
তাহাই পয়গম্বরী বৈশিষ্ট্য।

শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার ধারণার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি নিজেই বলেন ঃ

کسی قوم کی روحانی صحت کا دار ومدار اس کے شعرا
اورارٹسٹ کی الہامی صلا حیت پر ھوتا ھے لیکن یه ایسی چیز
نہیں جس پر کسی کو قابو حاصل ھویه یك عطیه ھے جس کی
خاصیت اورتاثیر کے متعلق اس کا پانے والا اس وقت تك تقیدی
نظر نہین ڈال سکتا جب تك که وہ اسے حاصل نه کر چکاھو-

কোন জাতির আধ্যাত্মিক সুস্থতা নির্ভর করে উহার কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ইলহামী যোগ্যতার উপর। কিন্তু ইহা অর্জন করার মতো বস্তু নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি দান মাত্র, ইহা পূর্ণরূপে করায়ত্ত হওয়ার পূর্বে উহার বিশেষত্ব ও প্রভাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোন সমালোচনামূলক উক্তি করা সেই দান প্রাপকের পক্ষেও সম্ভব হয় না।

ইকবালের কাব্য সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গীকৃত। তিনি শ্রোতার হৃদয়ে শক্তি ও আকর্ষণের এক অপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব করিতে কৃতসংকল্প, ইহার সাহায্যে তিনি প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার সাহিত্যের মূলে দুইটি প্রেরণা বিশেষভাবে বিদ্যমান। একটি হইতেছে মানব জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনা সম্পর্কীয় ধারণা, আর দ্বিতীয় হইতেছে বিশ্বলোকের উপর মানব মনের আধিপত্য স্থাপন। একথা সত্য যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সাহিত্য সাধারণত নিরস, শুষ্ক ও শৈল্পিক দৃষ্টিতে নগণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইকবাল নিজের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্যকে কাব্যিক চাকচিক্য ও আকর্ষণীয় মালমসলায় ভরপুর করিয়া এমনভাবে পেশ করিয়াছেন যে, পাঠকের মন সহজেই কাড়িয়া লয়। তাঁহার কাব্য শৈল্পিক মান ও মর্যাদা হইতে কোথাও বিচ্যুত কিংবা বঞ্চিত হয় নাই।

ইকবালের দৃষ্টিতে সত্য ও সৌন্দর্য একই জিনিস, সৌন্দর্যের গভীর সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান অনুধাবন করায়ই শিল্পের উচ্চতর মর্যাদা নিহিত। তাঁহার মতে সৌন্দর্য সত্যের উজ্জ্বল আর্শী বিশেষ এবং হৃদয় হইতেছে সৌন্দর্যের দর্পণ।

ইকবালের মতে বিজ্ঞান হইতে ভাবাবেগ বিবর্জিত সত্য, আর কবিতা হইতেছে এমন সত্য, যাহাতে অন্তরের জ্বালা ও বেদনার সংমিশ্রণ হয়। তিনি বলেন, বু'আলী সীনা মানতেক ও বিশ্লেষণমূলক যুক্তিজালে জড়াইয়া পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন, আর রুমী তাঁহার হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির সাহায্যে মহান সত্য লাভে অতি সহজেই সমর্থ হইয়াছেন।

ইকবালের সাহিত্যদর্শন তাঁহার আত্মদর্শনের অধীন এবং উহারই অনুগত। সাহিত্য হইতেছে 'খুদী' প্রকাশের একটি উপায় বা বাহনমাত্র। যে সাহিত্যে 'খুদী'র সন্ধান মেলে না, ইকবালের দৃষ্টিতে তাহা কোন প্রশংসনীয় জিনিস নহে।

ইকবালের মতে মানুষের 'খুদী'র পূর্ণত্ব বিধানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই হইতেছে প্রকৃতির ধর্ম, তাই প্রকৃতিকে জয় ও অধীন করিয়া লওয়ায়ই নিহিত রহিয়াছে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের এই চেষ্টা হইবে সৃষ্টিধর্মী, প্রকৃতির সাথে অবিরাম সংগ্রাম করিয়াই মানুষ লাভ করিবে তাহার মানসিক উৎকর্ষতা। জীবনের সকল লুক্কায়িত শক্তিকে জাগ্রত করা এবং জীবনকে পূর্ণত্ব দান করাই হইতেছে সংস্কৃতির কর্তব্য। ইকবাল নিজেই লিখিয়াছেন ঃ

> 'জীবনই হইতেছে সমস্ত মানবীয় কাজকর্মের মূল লক্ষ্য। জীবন সুন্দর হউক, উন্নতিশীল ও বর্ধিষ্ণু হউক, উহা সকলেরই কাম্য। কাজেই সকল শিল্প ও সাহিত্যেরই এই বিরাট উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক এবং যাহার দ্বারা জীবন সর্বাধিক প্রাচুর্য লাভ করিবে, তাহাই ততদূর উত্তম ও উৎকৃষ্ট হওয়ার মর্যাদা পাইবে। সর্বাপেক্ষা উন্নত সাহিত্য হইবে তাহা, যাহা আমাদের মধ্যে নিদ্রিত ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে, যেন উহার সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনের যাবতীয় জটিলতার সাফল্যজনকভাবে মুকাবিলা করিতে পারি। যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি মানুষকে স্বপ্নবিষ্ট করিয়া দেয় এবং জীবনের জন্যে অপরিহার্য পারিশার্শ্বিক নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ হইতে যাহা আমাদিগকে গাফিল করিয়া দেয়, তাহা মূলত ধ্বংস ও মৃত্যুর সমান। সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাহাই, যাহা আমাদের মধ্যে নব জীবন ও জাগরণের সঞ্চার করে; যাহা গাফলতির প্রচণ্ড নেশার উদ্রেক করে

তাহা নয়। সাহিত্য ও শিল্পের লক্ষ্য সাহিত্য ও শিল্পই, অন্য কিছু নয়— এই কথা যাহারা বলে, তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে, আমাদের জীবন ও বীর্যবত্তা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে মাত্র। এইসব অজ্ঞ বন্ধুদের হইতে সতর্ক থাকাই আমাদের কর্তব্য।

ঠিক এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, ইকবাল প্লেটোর দার্শনিক মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, যেসব দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম মানুষকে জীবিত থাকিতে নয়— মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতে উদ্বুদ্ধ করে, সেসবের উপর এই কারণেই তিনি সমালোচনার তীব্র কষাঘাত হানিয়াছেন।

বস্তুত শিল্পী চাহেন স্বীয় শিল্পের সাহায্যে জীবনের অভিব্যক্তি। জীবন সমস্যার সাথে যে শিল্পীর নিকটতর সম্পর্ক নাই, তার সৃষ্টি কৃত্রিম, নিষ্প্রাণ ও অন্তসারশূন্য হইতে বাধ্য। কবি তাহার হৃদয়ে উদ্বেলিত ভাবসম্পদকে একটি জীবন্ত জাগ্রত সত্যরূপে উপস্থাপিত করেন। আর কবি যাহা কিছু তাহার হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারেন, তদপেক্ষা অধিক বাস্তব সত্য আর কিইবা হইতে পারে। মানুষের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ হইতেছে তাহার 'হৃদয়'। এই 'হৃদয়ের' জীবন্ত থাকারই নাম জীবন। জীবন যত হীন ও নিকৃষ্টই হউক না কেন, মানুষের নিকট মৃত্যু অপেক্ষা তাহাই অধিক কাম্য। এই কারণে জীবনবাদী কাব্যই মানুষের পক্ষে অনির্বচনীয় সম্পদ। জীবনের দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি যন্ত্রের মতো সদা কর্মনিরত আর অপরটি নিত্য নূতন রূপলাভ করে ক্রমবিকাশ ও সুষ্ঠু লালন পালনের মাধ্যমে। কবির দৃষ্টি সমক্ষে এই উভয় দিকই দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল হইয়া আছে; কিন্তু স্বীয় কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে জীবনের এই পরিবর্তনশীল দিকটিকেই দেন অধিক প্রাধান্য। এই জন্যেই তাঁহার দৃষ্টি পরিবর্তনশীল ও বিপুল সম্ভাবনাময় জীবনের উপরই নিবদ্ধ থাকে প্রতিটি মুহূর্ত। যে পরম নিগূঢ় সত্য কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাহা কখনও ধরা পড়ে না। কবি তাহার অভ্যন্তরীণ ভাবধারার দৌলতে গভীর সত্যে অধিকতর গভীরতার সৃষ্টি করেন। পতনশীল শিল্প সামগ্রিক ও নৈতিক জীবনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হয় না। তাই কবি না কখনো আদর্শ নিরপেক্ষ হইতে পারেন, না পারে তাহার কাব্য।

কবির প্রকৃতি সম্পর্কে ইকবাল বলেন ঃ

فطرت شاعر سراپا جستجو ست
خالق و پروردگار آرزوست
شاعر اندر سینه ملت چو دل
ملتے بے شاعری انبارگل
سوز مستی نقشبند عالمے ست
شاعری بے سوز ومستی ماتمے ست
شعررا مقصود اگر آدم گری ست
شاعری هم وارث پیغمبری ست

কবির প্রকৃতি নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু
সৃষ্টি করে নিত্য নূতন আকঙ্ক্ষা
করে তার লালন-পালন।
কবির মর্যাদা অসীম—
জাতির বক্ষে যেমন দিল;
যে জাতি পায়নি কখনো কাব্যের অপূর্ব প্রেরণা
তা যেন মৃত্তিকার স্তুপ।
কবির হৃদয়জ্বালা
জ্যোতির্ময় করে তোলে একটি জগত।
মর্মজ্বালা আর আবেদনহীন কাব্যমালা,
অর্থহীন শোকগাঁথা মাত্র।
কবিতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়িয়া তোলা
এই কাব্যই হতে পারে
পয়গম্বরীর উত্তরাধিকার।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ইসলামী ভাবধারা

সার্বভৌমত্ব ও খিলাফত

ইসলামের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের মূল কথা এই যে— প্রভুত্ব, কতৃত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। নিখিল জড়জগতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও প্রকৃত শাসনকর্তা। তবে দুনিয়ার মানব সমাজের শৃংখলা বিধান, সমাজবদ্ধ মানুষকে উত্তরোত্তর প্রগতি ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করিবার জন্যে তাহাদের মধ্য হইতে একদল মানুষকে তিনি নেতৃত্ব দান করিয়া থাকেন। তাহারা আল্লাহ্‌রই শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান অনুযায়ী মানব জাতিকে মনযিলে মকসুদের দিকে পরিচালিত করে। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা হুকুমত কায়েম করিবার জন্যে মানুষ তাঁহার প্রতিনিধি। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করিয়া মানুষ সমগ্র জীব-জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করিয়াছে। ঠিক এই মূল দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই ইকবালের হুকুমত ও খিলাফত সংক্রান্ত যাবতীয় মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহা তাঁহার কাব্যের পাতায় পাতায় মধুক্ষরা ভাষা ও ছন্দে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইকবালের মতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। সমাজবদ্ধ মানবসমষ্টির কোন ব্যক্তি বা সংখ্যাগুরু দলই সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকারী হইতে পারে না।

سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے
حکمراں ہے بس وہی باقی بتان آزری

সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার
একমাত্র শাহানশাহ তিনি
লা-শরীক আল্লাহ
আর সব কিছুই আযরের প্রতিমা।

অতঃপর তিনি মানুষের খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম পদ্ধতিগুলি তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইকবাল একটি শক্তিশালী সুবিচারপ্রবণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হুকুমত কায়েম করিবার জন্যে দৃঢ় ঈমান ও 'প্রেম' অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

ولايت پاد شا هی علم اشيا کی جهانگيری
یه سب کيا هے فقط اك نقطه ايمان کی تفسيرين

কর্তৃত্ব, রাজশক্তি আর বস্তুবিজ্ঞানের বাহাদুরী
ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি মাত্র।

হুকুমত ও নেতৃত্ব ইকবালের মতে খিদমতগুজারী অর্থাৎ মানব সেবারই দ্বিতীয় নাম। কিন্তু জীবনের সকল প্রকার কাজের বুনিয়াদ 'প্রেমে'র উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ জনসেবার ভাবধারা জাগাইয়া তোলা আদৌ সম্ভব নয়। অন্যকথায় বৈরাগ্য ও রাজত্ব, দরবেশী ও বাদশাহীর পরস্পর সমন্বয় বিধান একান্তই আবশ্যক। এখানে ইকবাল তাঁহার 'ইনসানে কামিল' (perfect man)-কে ভুলিতে পারেন নাই এবং 'হুকুমাতে ইলাহীয়া' কায়েম করিবার জন্যে 'ইশকে মুস্তফা' বা নবী প্রেম একান্ত অপরিহার্য বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ এই প্রেমই জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং জাতির অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বিশৃংখলা দূরীভূত করিয়া উহাকে অটুট শৃংখলাসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেয়। 'পয়াম-ই-মাশ্‌রিক' গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

سروری در دیں ما خدمت است
عدل فاروقی فقر حیدری
ان مسلمانان که امیری کرد اند
درشهنشا هی فقیری کرده اند
هر که عشق مصطفیا سامان اوست
بحر و بر در گو شه دامان اوست

আমাদের জীবন বিধানে নেতৃত্ব
শুধু মাত্র মানব সেবা,
ফারুকের সুবিচার আর
আলী হায়দরের অনাড়ম্বর জীবন।
নেতৃত্ব করেছে যে মুসলমান,

শাহানশাহীর সাথে করেছে তারা
ফকীরী জীবন যাপন।
জীবন পাথেয় যার মুস্তফার প্রেম,
পূর্ণ আধিপত্য বিরাজিত তার
জলস্থলের উপর।

'আর্‌মগানের হিজাজ' গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

خلافت بر مقام ما گواهی است
حرام است نچه برما پادشاهی است
ملو کیت همه مکر است ونیر نگ
خلافت فقط ناموس اهی الهی است

খিলাফত আমাদের দৃষ্টিতে সত্যের প্রতিভূ
হারাম আমাদের কাছে মানব প্রভুত্ব।
সাম্রাজ্যবাদ প্রতারণাসর্বস্ব ও বহুরূপী,
খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র প্রতীক
খোদায়ী মর্যাদার।

ইকবাল রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন। ইউরোপ রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যে পদ্ধতি উপস্থাপিত করিয়াছে তাহা সওদাগরী, নরহত্যা, রক্ত শোষণ ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে শাসনতন্ত্রের দাসত্বের কাজে নিয়োজিত, তাহার পরিণাম ইকবালের দৃষ্টিতে 'বিনাযুদ্ধে নর হত্যা' (کشتن بے حسرب وضرب) ফিরিঙ্গী সভ্যতার চরম উদ্দেশ্যও তাহাই ঃ

ازضعیفاں ناں ربودن حکمت است
ازتن شاں جاں ربودن حکمت است
شیوه تهذ یب نو ادم دری است
پرده ادم دری سوداگری است

আজকের বিজ্ঞান হচ্ছে
দুর্বলের মুখের অন্ন ছিনিয়ে নেয়া
নরহত্যাও আজ বিজ্ঞানে শামিল।

মানবদেহকে ছিন্নভিন্ন করাই আজ
নব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য,
এই নরহত্যার আড়ালে রয়েছে
সওদাগরীর চক্রান্তজাল।

'আর্‌মগানে হিজাজ' গ্রন্থের রুবায়ীতে তিনি ইসলাম ও পাশ্চাত্য শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন ঃ

مسلمان فقر وسلطانی بہم کرد
ضمیرش باقی وفانی بہم کرد
ولیکن الا مان ازعصر حاضر
که سلطانی وشیطانی بہم کرد

মুসলমানদের কাছে রাজশক্তি ও ফকীরী
পরস্পর সংযুক্ত,
আত্মা তার স্থায়ী, অথচ ধ্বংসশীল।
পরিত্রাণ চাই আধুনিক কালের প্রভাব থেকে,
রাজশক্তির পশ্চাতে রয়েছে আজ
শয়তানী ষড়যন্ত্র।

ইকবাল যেমন মানব জীবনের অন্যান্য সমস্ত কাজ-কারবারের ভিত্তি নিছক মানববুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বুদ্ধিবাদকে (Intellectualism) মানব জগতের জন্যে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক বলিয়া মনে করেন, তেমনি রাষ্ট্রনীতি ও শাসন পদ্ধতিতেও তিনি নিছক মানববুদ্ধির উপর বুনিয়াদ স্থাপন করিতে মোটেই রাজী নহেন। কারণ যে আইন-কানুন শুধুমাত্র মানুষের বিকৃত বুদ্ধিসমন্বিত মস্তিষ্ক দ্বারা রচিত হইবে, তাহাতে মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণ ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া থাকিবেই। বুদ্ধিবাদী মানুষ কোন সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক কাজকর্মে সেই সমাজের ভিত্তিতে দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করে না, বরং সেই সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ অনায়াসেই সংরক্ষিত হইতে পারিবে, কেবল এই দিকেই তাহার লক্ষ্য নিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই কারণেই বুদ্ধিবাদের ভিত্তিতে রচিত আইন কানুন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত ও বিপদমুক্ত করিতে এবং ন্যায়ের শাসন দান করিতে পারে না। বরং সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রচিত আইনের সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য

হয়। গণতন্ত্রে যেহেতু একটি সংখ্যালঘু দলকে অন্যায়ভাবে অন্য একটি সংখ্যাগুরু দলের অধীন করা হয় এবং তাহাদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করিয়া দেয়া হয়, ইকবালের মতে তাই এই আইন রচনা পদ্ধতি বাতিল করিয়া বুদ্ধিবাদের পরিবর্তে 'অহীর' সাহায্যে অবতীর্ণ খোদায়ী কানুনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা— অন্য কথায় পূর্ণরূপে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সকল মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ আল্লাহ্‌র নিকট সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বলিতে কিছুই নাই, সকল মানুষই তাহার দৃষ্টিতে সমশ্রেণীভুক্ত ও সমমর্যাদার দাবিদার। 'জাবীদনামায়' ইকবাল বলেন ঃ

بندۂ حق بے نیاز از ہر مقام
نے غلام اورا نہ او کس را غلام
وحی حق بینند سود همه
نگاهش سود وبهبود همه
بندة حق مرد ازاد است وبس
ملك وائينش خدا داد است وبس
رسم وراه و دين وآئينش زحق
زشت وخوب وتلخ نو شينش زحق

'বান্দায়ে হক' নয় কভু স্থানগণ্ডিতে সীমাবদ্ধ.
কেহ নয় তার গোলাম,
আর গোলাম নয় সে অপরের।
আল্লাহ্‌র অহী মংগলময়
তার দৃষ্টিতে,
সব কিছুই তার চোখে কল্যাণ অভিসারী।
'বান্দায়ে হক' হচ্ছে আযাদ–স্বাধীন,
রাজ্য ও আইন সবই আল্লাহ্‌র দান।
রীতি ও পন্থা, জীবন বিধান ও আইন—
সব কিছুরই উৎস এক আল্লাহ্।
ভালো ও মন্দ, তিক্ত ও মধুর—
সব কিছুই আগত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।

'বালে জিবরীল' ও 'জরবে কলীম' গ্রন্থে আল্লামা ইকবাল প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতি এইজন্যে নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে,

তাদের নেতৃবৃন্দ প্রাচ্য সভ্যতার মূল ভাবধারার সন্ধান লইতেই আদৌ সক্ষম হন নাই। 'জরবে কলীম'-এ কবি বলেন ঃ

میری نواسے گرییاں لاله چاك هوا
نسیم صبح چمن کی تلاش مین هے ابهی
میری خودای بهی سزاکی هے مستحق لیکن
زمانه دار و زسن کی تلاش مین هے ابهی

আমার বলিষ্ঠ সুরঝংকার
ফুটিয়ে তুলেছে লালা'র ফুলদল,
ভোরের মৃদু হাওয়া এখনো ব্যাকুল
বাগিচার সন্ধানে।
খুদী আমার দণ্ডের যোগ্য বটে,
কিন্তু যুগ এখনো খুঁজে ফিরছে ফাঁসিকাষ্ঠ।

এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লামা ইকবাল তাঁহার বক্তৃতাবলীতে খিলাফত সম্পর্কে তুর্কীদের 'ইজতিহাদ'কে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও ইহা হইতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তুর্কীদের এই ইজতিহাদের মূলে ইসলামী ভাবধারাই আসল পথপ্রদর্শক ছিল কিংবা ইসলামী অনুভূতি লোপ পাইয়া যাওয়ায় তুর্কীদের মধ্যে যে পারিবারিক ও গোত্রভিত্তিক আভিজাত্য জাগ্রত হইয়াছিল, তাহাই তাহাদিগকে এই পথে টানিয়া নিয়াছে। 'আরমগানে হিজাজ' গ্রন্থে তুর্কীদের সম্পর্কে কবি লিখিয়াছেন ঃ

به ملك خویش عتمانی امیراست
دلش آگاه و چشم اورابصیر است
نه یندارى كه رست ازبند افرنگ
هنوز اندر طلسم او اسیر است

তুর্কী জাতি অর্জন করেছে স্বাধিকার
তাদের অন্তর হয়েছে সচেতন
আর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী;
কিন্তু ভেবো না তাদেরকে
পশ্চিমী দাসত্ব থেকে মুক্ত,
এখনো তারা বন্দী তার যাদুজালে।

আদর্শ সমাজ

ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একটি জীবন্ত ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পিত সমাজ হইবে অধুনা প্রচলিত সকল আইন-কানুন, চিন্তা-পদ্ধতি এবং বর্তমানের সর্বাধিক প্রচলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মধারা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অপূর্ব ও অতুলনীয় সত্তার সমন্বয়। উহার প্রত্যেকটি ব্যক্তি হইবে অতিমানুষ— আল্লাহ রব্বুল আলামীনের গুণে গুণান্বিত। এই নূতন সমাজ হইবে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যের বাস্তব প্রতীক; আধুনিক স্থূল বস্তুবাদ ও বুদ্ধিবাদের দুর্জয় প্রভাবে সৃষ্ট সকল দোষ-ত্রুটি হইতে ইহা হইবে চিরবিমুক্ত। ইকবালের মতে এই জীবন প্রতিভাসম্পন্ন ও বিপুল কর্মপ্রেরণাশীল সমাজ এমন একটা আদর্শ ও নীতির উপর ভর করিয়া মস্তক উন্নত করিবে, যে আদর্শের দৃষ্টিকোণ পাশ্চাত্য জাতির মতো সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র ও নীচ হইবে না; বরং তাহার দর্শন ও চিন্তাধারা হইবে মানুষ ও জড়জগতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সর্বাধিক মানবোচিত, দিগন্তপ্রসারী, সর্বব্যাপক এবং সর্বাধিক আধ্যাত্মিক। বর্তমান সময়ে পৃথিবী ত যতগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিপদ্ধতি বিদ্যমান তন্মধ্যে ইসলামই হইতেছে ইকবালের দৃষ্টিতে চরম লক্ষ্যবস্থ ও পরিকল্পিত সমাজের পূর্ণ সাফল্যের একমাত্র পন্থা। অবশ্য ইকবালের ন্যায় একজন দার্শনিক ও চিন্তাশীলের পক্ষে এইরূপ কোন বিশেষ সমাজ ও জাতিকে উন্নত করার চেষ্টা বা মনে মনে তাহার কামনা করা বাহ্যদৃষ্টিতে অনেকের নিকটই বিস্ময়ের কারণ সন্দেহ নাই। বিশেষত ইউরোপ ও ভারতের এক শ্রেণীর লোকের নিকট ইকবালের এই অভিমত মোটেই সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। মিঃ ডিকেন্স, ফরেস্টার ও নিকলসন এই সমাজ পরিকল্পনাকে মোটেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই; কিন্তু স্বয়ং ইকবাল যেমন বলিয়াছেন, তাঁহার এই পরিকল্পনা কাহারও অন্ধ অনুসরণ কিংবা ভক্তির আতিশয্যের ফল নয়, বরং তিনি প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শাসনপদ্ধতিতে বিবর্তনশীল অনন্ত সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার পরিকল্পিত জীবন্ত ও পূর্ণ সমাজ সংগঠনের জন্যে দুনিয়ার অগণিত

রীতিপদ্ধতির মধ্যে একমাত্র ইসলামকেই বুনিয়াদ স্বরূপ ধরিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইকবাল তাঁহার সকল গ্রন্থের মধ্যেই ইসলামী মিল্লাতকে তাঁহার নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং স্থানে স্থানে এই বিশেষ সমাজকে 'ভাবীকালের সর্বোত্তম মানবসংঘ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, দুনিয়ায় সর্বাধিক ব্যাপক ও বিশাল মানবীয় সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে পরিকল্পনা ইসলাম উপস্থাপিত করিয়াছে, দুনিয়ার আর কোন বিধানই তাহার সাথে তুলনীয় নয়। বস্তুত ইসলামের সীমা-পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক— অনন্ত। ইহার সত্তা স্থান ও কালের (Time and space) অতীত। এ বিষয়ে ইকবাল বলেন ঃ

> ইসলাম সমস্ত জড়বস্তুর বন্ধন ও গোলামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া থাকে। উহার জাতীয়তার ভিত্তি একটি খাঁটি ও পবিত্র পরিকল্পনার উপর স্থাপিত। ইসলাম গঠন করিতে চায় এমন এক মানবগোষ্ঠী, যাহাদের মধ্যে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হইবার পূর্ণ উপযোগিতা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। ইসলামে জাতীয়তার পরিকল্পনা জাতি সম্পর্কিত অন্যবিধ মতাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহার মূল আদর্শ ও ভিত্তি ভাষার ঐক্য নয়, বাসস্থানের ঐক্য নয়, এমনকি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষারও ঐক্য নয়; বরং উহার মূল নিয়ম হইতেছে নিখিল জড়জগত সম্পর্কে মত ও বিশ্বাসের ঐক্য ও সামঞ্জস্য— যাহা সকল মানুষকে এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রের শাশ্বত নিগড়ে গ্রথিত করিয়া দিতে সক্ষম— এই মতাবলম্বী ব্যক্তি আফ্রিকার কৃষ্ণাংগ নিগ্রো, মরু বেদুঈন বীর আরব, গংগার তীরভূমি অধিবাসী আর্য অথবা পামীরের উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী— যেই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করা হয় না। দেশ ও মাটির পার্থক্য তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে না, কোন বস্তুতান্ত্রিক বা ভৌগোলিক সীমারেখার বৈষম্য তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর রচনা করিতে পারে না এবং কোন বংশ বা ভাষার বিরোধও তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে পারে না। (Reconstruction of Religious Thought in Islam)

এই সমাজ বিধানকে আল্লামা ইকবাল দুনিয়ার সকল প্রকার সমাজ বিধানের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক মঙ্গলকর বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। এই সমস্ত মতবাদ ইকবাল 'রুমুজে বে-খুদী' গ্রন্থে তাঁহার সম্পূর্ণ

নিজস্ব মুগ্ধকর ভঙ্গিতে বারবার প্রকাশ করিয়াছেন। ইসলামী মিল্লাতের মূল বুনিয়াদ তওহীদ ও নবুয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইজন্যে 'স্থানের' (Space) দৃষ্টিতে তাহা অসীম ও অনন্ত; একথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

جوهرما بامقامے بسته نيست
بادهٔ تندش بجامے بسته نيست
هندی وچینی سفال جام ماست
رومی و سامی گل اندام ماست
قلب ما از هند و روم شام نیست
مرزبوم او بجز اسلام نیست
عقدهٔ قومیت مسلم کشود
ازوطن اقائے ما هجرت نمود
حکمتش یك ملت گیتی نورد
براساس کامهٔ توحید کرد

প্রতিভা আমাদের সীমাবদ্ধ নয় স্থান গণ্ডিতে,
তার সূরারস কোন বিশেষ পাত্রে বন্দী নয়।
ভারত ও চীনের মৃত্তিকায়
তৈরী আমাদের পানপাত্র;
সৃষ্ট হয়েছে আমাদের দেহ
তুরস্ক ও সিরিয়ার মাটি থাকে।
অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে;
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া।
মহান নবী হিজরত করলেন জন্মভূমি থেকে,
এমনি করে তিনি উদ্‌ঘাটন করলেন
মুসলিম জাতীয়তার তথ্য।
জ্ঞানদীপ্তি তার রচনা করেছে এক বিশ্বজাতি
কালেমায়ে তাওহীদের ভিত্তিতে।

ইউরোপে ইকবালের এই অভিমত সাধারণভাবে সম্বর্ধনা লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু ইউরোপেও এমন সব মহাত্মা রহিয়াছেন, যাঁহারা এই ইসলামী মতাদর্শের সত্যতা ও সার্থক সৌন্দর্য স্বীকার করেন। ইসলামী মিল্লাত যেরূপ কোন ভৌগোলিক সীমারেখা স্বীকার করে নাই, তদ্রূপ কালের মাপকাঠি দিয়াও তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা যায় না।

گرچه قوم بمیرد مثل فرد
ازاجل فرمان پذیرد مثل فرد
ازاجل ایں قوم بے پر واستے
استوار از نحن نزلنا ستے
ماکه توحید خدا را حجتیم
حافظ رمز کتاب وحکمتیم

যদিও সমাজ ব্যক্তির মতো মরণশীল,
যদিও সে সাড়া দেয় মৃত্যুর ডাকে
ব্যক্তিরই মতো,
তথাপি এ কওম বিজয়ী মৃত্যুভীতির উপরে,
সুরক্ষিত সে
খোদায়ী বাণীর শক্তি দ্বারা।
'তওহীদের খোদা'ই হচ্ছে আমাদের দলিল,
রক্ষক আমরা খোদায়ী রহস্য ও বিজ্ঞানের।

আবার ঃ

در جہان بانگ اذان بودست وهست
ملت اسلامیاں بودست وهست
عشق ائین حیات عالم است
امتزاج سالمات عالم است
عشق از سوز دل ما زنده است
ازشرار لا اله پائنده است
گرچه مثل غنچه دلگیرم ما
گاستاں میسرد اگر میریم ما

চিরদিন জেগে উঠেছে আর আজো উঠছে
আযান ধ্বনি পৃথিবীর বুকে,
ইসলামী মিল্লাতের অস্তিত্ব
অতীতেও ছিলো, আজো রয়েছে।
প্রেম হচ্ছে দুনিয়ার জীবন-বিধান,
অনুপরমাণুর মিলনকেন্দ্র।
প্রেম সঞ্জীবিত রয়েছে আমাদের মর্মবেদনায়,
স্থায়ী হয়ে আছে তা'
'লা-ইলাহা'র স্ফুলিং সংস্পর্শে,
যদিও আমরা প্রেম ভারাতুর
কুঁড়ির মতো,
তথাপি মৃত্যু আমাদের
বয়ে আনবে গুলবাগিচার মৃত্যু।

এই সমস্ত কবিতায় যেসব নিগূঢ় তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে ঠিক তাহাই ইকবাল বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার মাদ্রাজে প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতায়। 'কালের' (Time) দৃষ্টিতে ইসলামী জাতির কোন শেষ সীমা নাই— এই দাবি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকাট্য সত্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যুগবিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামের আইন-কানুনের নূতন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং ক্রমাগত নূতন ঘটনার সাথে উহার বাস্তব প্রয়োগ করা না যাইবে। এই একটি মাত্র পন্থাই ইসলামী শরীয়তকে জীর্ণ, প্রাচীন ও অকেজো হওয়ার মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। আর ইহারই দৌলতে ইসলাম মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমতালে চলিবার যোগ্য হইতে পারে। ইকবালের মতে ইহাই হইতেছে ইসলামী ইজতিহাদের নীতি। ইহাই মুসলিম মিল্লাতের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষকে কুরআনের ভিত্তিতে ক্রমাগত নূতন নূতন সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন ব্যাপারে শরীয়তের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করিবার অধিকার দান করিয়াছে। কিন্তু একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সংকীর্ণ দৃষ্টি আলেম এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেরই ইজতিহাদ করিবার জন্যে কোশেষ করা মিল্লাতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, সন্দেহ নাই।

মোটকথা এই আদর্শ সমাজ (ideal society) সৃষ্টি করাই ইকবাল-জীবনের বৃহত্তম উদ্দেশ্য। 'আসরারে খুদী'র ইংরেজী অনুবাদক ডঃ নিকল্সন্ অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই সব মতবাদের দিক দিয়ে

ইকবালকে একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় না— মনে হয় একজন গোড়া ধার্মিক মুসলিম বলিয়া। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা ও মত একজন 'মুসলিম' ব্যক্তির কথা ও মত বলিয়া অনুভূত হয়। অধ্যাপক নিকলসনের এই কথার সমর্থন করা কিংবা ইহার প্রতিবাদ করা উভয়ই আমাদের পক্ষে মুশকিল। বস্তুত ডঃ নিকলস্‌ন যখন ইকবালের এই সব মতবাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন সহসাই তাঁহার চোখের সম্মুখে সাম্প্রতিক কালের মুসলিম সমাজের বিকৃত ছবি ভাসিয়া উঠে, ফলে এই দুইটি জিনিসের মধ্যে বৈষম্য ও আকাশ-পাতালের পার্থক্য দেখিতে পাইয়া তিনি প্রায় দিশাহারা হইয়া যান। অথচ ইকবালের লক্ষ্য ইসলামের মূল প্রকৃতি নিহিত বিপুল সম্ভাবনা ও উন্নতিশীল উপাদানের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত ইদানীং তাহা অংকুরিত, বিকশিত ও ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ার সুযোগ পাইতেছে না। আর ইকবাল যেমন বলিয়াছেন, হয়তো বা মুসলিমদের নির্বিরোধ দিগ্বিজয়ই এই পথে একমাত্র বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই বা বিচিত্র কি ? বস্তুত ইসলাম বর্তমান দুনিয়ায় একটি মতাদর্শ, একটি পরিকল্পনা (Theory) মাত্র পরিণত হইয়া রহিয়াছে এবং প্রকৃতির শক্তিনিচয় নিরন্তর অবিশ্রান্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে এই মতাদর্শকে বাস্তবরূপ দান করিতে চলিয়াছে। ইকবালের এই সমাজ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেকেই এই আপত্তি তুলিয়াছেন যে, আদর্শের দিক দিয়া ইকবালের দর্শন যদিও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য; কিন্তু ইহাকে বিশেষ কোন জাতির সাথে জড়িত করিয়া দেওয়া সংকীর্ণতা ছাড়া আর কি হইতে পারে! ইহার জওয়াব ইকবালের মুখে শুনিয়া লউন, তিনি বলেন।

'কাব্য ও দর্শনক্ষেত্রে মানুষের আদর্শ সব সময়ই সর্বাত্মক ও সাধারণ হইয়া থাকে; কিন্তু বাস্তব জীবনে কাজের ভিতর দিয়া তাহাকে রূপায়িত করিবার সময় নির্দিষ্ট কোন জাতিকে কেন্দ্র করিয়াই কাজ শুরু করিতে হইবে, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এই জাতি বা দলের স্বতন্ত্র একটি আদর্শ ও কর্মপন্থা থাকা আবশ্যক, যাহার সীমারেখা কার্যত ও ভাষাগত প্রচারের সাহায্যে অধিকতর বিশাল, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী করিয়া তোলা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমার মতে এই আদর্শ হইতেছে ইসলাম। এই 'আদর্শ সমাজের' গঠন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক লইয়া আমরা আলোচনা করিব না। ইহার কয়েকটি আবশ্যকীয় মৌলিক উপাদানের দিকে সংক্ষেপে ইশারা করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

পূর্ণ মানুষ

ব্যক্তি মানুষের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে সমাজ। ইকবালের মতে এহেন 'আদর্শ সমাজ' সৃষ্টির জন্য অনুরূপ আদর্শ মানুষেরই একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় এই আদর্শ ব্যবস্থাকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত করা এবং উহাকে পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হইবে না। এই আদর্শ মানুষের 'খুদী' পূর্ণপরিণত, খাঁটি ও পরিপক্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইকবালের দৃষ্টিতে 'খুদী' এমন একটি জ্যোতি-প্রবাহ, যাহা উৎসারিত হয় 'প্রেম' হইতে। এই 'প্রেমই' খুদীর পরিপূর্ণতার লাভের একমাত্র নিয়ামক। এই খুদীই সেই সমাজের সকল লোকের মধ্যে নির্ভীকতা, বীরত্ব ও পৌরুষ সৃষ্টি করিবে। 'খুদী' বিশ্বশৃংখলার মর্মকেন্দ্র— ইহা ছাড়া সৃষ্টির মূল উপাদানই পরস্পর সম্মিলিত ও সংযোজিত হইতে পারে না।

وانمودن خویش را خوی خودی است

خفته درهر ذره نیروی خودی است

খুদীর চিরন্তন স্বভাব হচ্ছে
পূর্ণ আত্মবিকাশ,
ঘুমন্ত রয়েছে খুদীর অনন্ত শক্তি
প্রতি পরমাণুর বুকে।

যেহেতু 'খুদী'র পূর্ণতা হইতেই সত্যিকার জীবন উদ্ভূত হইয়া থাকে, এই জন্যে কঠোরতা, শক্তি-সামর্থ্য এবং দৃঢ়তা 'জীবনে'র অপরিহার্য উপাদানের শামিল। স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তি যতই সংগ্রাম সহিষ্ণুতা ও দুঃখ দুর্ভোগ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইবে, তাহাদের মধ্যে 'খুদী' ততই পূর্ণতা লাভ করিবে, কিন্তু 'খুদী'র অক্ষয় ও স্থায়ী হওয়ার জন্যে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হওয়া অপরিহার্য। কারণ ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন ও অশ্রান্ত অনুসন্ধানেই প্রকৃত জীবন নিহিত রহিয়াছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও চেষ্টা-সাধনারই নাম সফল জীবন। যতদিন না মানুষের মনে আশা ও উদ্দেশ্য লাভ করিবার একটা দূরন্ত উন্মাদনা জাড়িয়া উঠে, ততদিন তাহার জীবন কিছুতেই পূর্ণ পরিণত ও সুসংগঠিত হইতে পারে না। 'আসরারে খুদী'তে ইকবাল বলেনঃ

زندگی در جستجو پوشیده است
اصل او در آرزو پوشیده است
دل سوز ارزو گیرد حیات
غیر میرد چو او گیرد حیات
چوںز تخلیق تمنا باز ماند
شہپرش بشکست و از پرواز مالد

চাওয়ার মাঝেই মানুষের জীবন,
উৎসমূল তার লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষার ভিতরে।
অন্তর আহরণ করে তার জীবন
এই আকাঙ্ক্ষার অগ্নি থেকে,
যখন সে পায় জীবন,
তখনই মৃত্যু হয় সব কিছুর
যা অসত্য।
যখন তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে
সে হয় বিরত,
ভগ্ন হয়ে যায় তার পক্ষ
করতে পারে না সে উত্থান।

'খুদী'কে বিন্দুমাত্র দুর্বল করিতে পারে, ইকবাল এমন সব কার্যক্রমের ঘোরতর বিরোধী। তিনি প্লেটোর 'ছাগ-সুলভ' দর্শনকে এই কারণেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যে, উহাতে জীবনের পরিণাম ধরিয়া লওয়া হইয়াছে 'মৃত্যু'। ইকবালের মতে এই ধরনের শিক্ষাই খুদীকে দুর্বল হীন ও ক্ষীণ করিয়া দেয়। যাহারা নিজেরাই দুর্বলচেতা ও নীচ প্রকৃতির মানুষ, মূলত তাহারাই এই ধরনের 'মারণাস্ত্র' আবিষ্কার করিয়া থাকে। কারণ তাহাদের একান্ত বাসনা এই যে, সবল, শক্তিমান এবং উন্নত শির বীরপ্রকৃতির মানুষও ঠিক তাহাদেরই মতো দুর্বল ও বীর্যহীন হইয়া একেবারে রসাতলে ভাসিয়া যাউক। এই প্রকারের শিক্ষার তিক্ত ফল ও অশুভ প্রভাবের কথা ইকবাল একটি গল্পের মাধ্যমে সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঘ মোষের খুদীবিরোধী উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মাংস খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিল, অথচ ইহার পরিণাম বাঘের মৃত্যু ও বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

انکه کردے گو سفند ان شگار
کرد دین گوسفند ان، اختیار
ازعلف آں تیزی دنداں نما ند
هئبت چشم شرر افشاں نماند
آں جنوں کوشش کامل نماند
اں تقاضائے عمل دردل نماند
تیر بیدار از فسوں بیش خفت
انحظاط خویش راتهذیت گفت

যারা শিকার করতো মেষ
এবার গ্রহণ করলো মেষের ধর্ম।
তৃণ ভোজন ভোঁতা করে দিল তাদের দন্ত
নির্বাপিত করলো তাদের চোখের ঔজ্জ্বল্য।
থাকলো না তাদের অতি পরিশ্রমের প্রমত্ততা,
কর্মের আকাঙ্ক্ষা আর থাকলো না
তাদের অন্তরে।
জাগ্রত ব্যাঘ্র মেষের যাদুতে হলো
তন্দ্রাভিভূত,
এই অধপতনেরই নামকরণ করলো সে
নৈতিক শিক্ষা।

নিট্শের ন্যায় ইকবালও শৌর্যবীর্য ও আত্মশক্তি বর্ধনের জন্য আধিপত্য ও প্রাধান্য লাভ অপরিহার্য মনে করেন। নিট্শে বলেন, শক্তি ও পৌরুষকেই বলা হয় পুণ্য। অধিকন্তু যাহাই মানুষের মধ্যে দিগ্বিজয় ও পরাক্রমের দূরন্ত বাসনা ও শক্তির উন্মেষ করে, তাহাকেই বলা হয় পুণ্য। পক্ষান্তরে দুর্বলতাই হইতেছে সমস্ত পাপের মূল উৎস। তাই প্রত্যেক পদে পদেই তিনি জাতিকে বাজপক্ষীর দর্শন শিক্ষা দেন। 'কবুতর' হওয়া তাঁহার দৃষ্টিতে জীবনের নিকৃষ্টতম অভিশাপ। দুর্বলতা এমন এক মহাপাপ, যাহার শাস্তি আকস্মিক মৃত্যু ভিন্ন কিছুই নয়। কাড়াকাড়ি, জোর-জুলুম ও বল প্রয়োগই হইতেছে তাহার নিকট জীবনের সত্যিকার সম্ভোগ— সুষ্ঠু পরিচয়। দৃঢ়তা ও বীর্যবত্তা বিশ্ববিজয়ের অন্যতম উপায়। মোমের মতো নম্রতা, রেশমের ন্যায়

মসৃণতা— আধুনিক ভাষায় যাহাকে বলা যায় 'মেয়েলিপনা' জাতীয় অধঃপতনের পূর্ব লক্ষণ মাত্র। বিপদের মধ্যে জীবন যাপন করা, সকল প্রকার চিন্তা ও বিভীষিকার মধ্যে নিমজ্জিত থাকা উন্নতির প্রধান সোপান। মোটকথা, শ্রমসাধনা ও কঠোর রুক্ষতাই হইতেছে আসল জীবন। ইহা না হইলে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না। আল্লামা ইকবাল ইহাকেই বলেন 'জিহাদ' (struggle), তিনি মুসলিম ব্যক্তির চারিটি প্রধান গুণ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

قہاری و جباری و قدوسی و جبروت

'বিক্রম, বীর্য, মাহাত্ম্য ও শক্তিসামর্থ্য।'

জিহাদকেই ইকবাল জীবন চেতনার অক্ষুণ্ণতার জন্যে অপরিহার্য মনে করেন। কিন্তু কোন্ জিহাদ সমগ্র দুনিয়াকে পদানত করিয়া সমস্ত শক্তি নিজের পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করিবার কাজে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নয়— আল্লাহ্‌র কালেমার ব্যাপক প্রচার ও বিশ্বের বুকে আল্লাহ্‌র হুকুমত কায়েম করিবার জন্যে যে জিহাদ, তাহাকেই তিনি একান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন। মাটির বুভূক্ষা ও বিশ্বজয়ের জন্যে রক্তপাত করা ইকবাল একেবারেই হারাম মনে করেন।

هرکه خنجر بهر غیر الله کشید
تیغ اوراسینه اوارمید

যে কেহ গ্রহণ করবে তরবারি
অপর কিছুর জন্যে
আল্লাহ ছাড়া,
তরবারি তার বিদ্ধ হবে
তার আপন বক্ষে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ইকবালের দৃষ্টিতে এই জিহাদের জন্যে সর্বশেষ অবলম্বন শুধুমাত্র যান্ত্রিক শক্তিই নয়— উহার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তিও একান্ত অপরিহার্য। এই দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োগে ও সংযোগে পৃথিবীর বুকে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই হইবে প্রকৃত পক্ষে দুনিয়াময় নিশ্চিত শান্তির, বাস্তব উৎস। ইকবাল নিজেই বলিয়াছেন ঃ

'আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, জড়শক্তির প্রত্যেকটি 'পরমাণু' হাজার বৎসরের ক্রমবিবর্তনের পরে বর্তমানের আকার ও রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই আকারেও উহা স্থায়ী নয়। উহা নিরন্তর পরিবর্তিত ও ক্রমবিকশিত হইয়া চলিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিরও ঠিক এই অবস্থা; অর্থাৎ শক্তি মানুষ অসংখ্য দল ও সম্প্রদায়ের সংগ্রাম সাধনার পরে এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। তবুও উহা অতি সহজেই বিবর্তিত হইতেছে। কাজেই নিজের ব্যক্তিসত্তাকে অক্ষয় করিয়া রাখিতে হইলে অতীত জীবনে লব্ধ সমস্ত অভিজ্ঞতা, আর অতীতকালে জীবনে স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে যেসব শক্তি সাহায্য করিয়াছে, ভবিষ্যতের মঙ্গলময় ব্যবস্থায় সেই সবকে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত করা একান্ত আবশ্যক। এই কথা দ্বারাই বোঝা যাইবে যে, যে অর্থে আমি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ নৈতিক বা আধ্যাত্মিক।'

জিহাদের পর খুদীর প্রবর্ধন ও শক্তি সংগ্রহের জন্যে তিনটি মন্‌যিল অতিক্রম করিতে হয় ঃ আনুগত্য, আত্মসংযম ও আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব বা নিয়াবতে ইলাহী।

قطرها دریاست آزائین وصل
ذرها صحر است از آئین وصل
باطن هر شئیازآئین قوی
تو چرا غافل ازین سامان روی

ছোট ছোট বারিবিন্দু
ঐক্যের নিয়মে হয়ে উঠে মহাসমুদ্র;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকনা হয় সাহারা।
আইনের বাধ্যতা
সকলের মধ্যে আনে অপরিমের শক্তি
এই শক্তির উৎসকে
কেন করবে তুমি অবহেলা ?

শক্তি যখন আনুগত্য ও আত্মসংযমের মনযিল পার হইয়া আসে তখন সে প্রবেশ করে 'নিয়াবতে ইলাহী' বা খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের মনযিলে। এই পোক্তদিল সমন্বিত মানুষকেই ইকবাল 'আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহারই ভক্তির আতিশয্যে ইকবালের হৃদয় উচ্ছ্বসিত।

نائب حق درجہاں بودن خوش است
بر عناصرحکمراں بودن خوش است
نائب حق هم چو جان عالم است
هستی او ظل اسم اعظم است

আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়া এই বিপুল বিশ্বের
আর আধিপত্য করা,
তাঁর সৃষ্ট পদার্থের উপর
কতো মধুর আনন্দময়!
আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি
এই বিপুল বিশ্বের আত্মাস্বরূপ,
আর অস্তিত্ব নেই মহানামের প্রতিবিম্ব।

ইকবাল এই বীর পুরুষের উদগ্রীব প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার নিগূঢ় সত্তা পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসংযমের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই নিয়াবতের সুমহান পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এহেন 'বীর পুরুষ'— 'মাহদীয়ে বরহক, আমীরে কারাওয়াঁ এবং শাহসওয়ার" এর— পরিকল্পনা ইকবালের শেষ জীবনের গ্রন্থাবলীতে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'আরমগানে হিজাজ' গ্রন্থের এক স্থানে তিনি নিজকে এই 'অনাগত কারাঁভার পশ্চাতে উদ্‌গীর্ণ ধুলিকণা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বস্তুত এই 'নায়েবে হক'-এর ধারণা সম্পূর্ণ নূতন নহে, ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের এক বহু প্রাচীন 'কল্পনা' (idea)— বহু সনাতন ঐতিহ্য হইতে উহা গৃহীত হইয়াছে। নিটশের 'অতিমানুষ' (Superman), কার্লাইলের 'হিরো' এবং গ্যেটের 'জেনিয়াস' (Genius) এই ধরনেরই কল্পিত পুরুষ। ইকবাল ও নিট্‌শের কল্পনায় যে সামান্য মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচক এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইকবাল তাঁহার 'Perfect man' বা 'পূর্ণ মানুষের' কল্পনা এই জার্মান দার্শনিকের নিকট হইতে ধার করিয়াছেন অথচ ইকবাল নিজেই এ সম্পর্কে বলেন ঃ

আমি এই 'কল্পনা' নিট্‌শের নিকট হইতে গ্রহণ করি নাই। তাসাউফ শাস্ত্রের 'কামিল ইনসান' আজ হইতে বিংশ বৎসর পূর্ব হইতে আমার মানসপটে বিদ্যমান। ইংরেজদের পক্ষে নিজ দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত

আলেকজাণ্ডারের মতবাদ অধ্যায়ন করা কর্তব্য। কিন্তু আমাদের দুইজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আলেকজান্ডারের মতে এই প্রতীক্ষিত নিগূঢ় সত্য অস্তিত্বসম্ভব এক আল্লাহ্‌র আকারে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মত এই যে, আল্লাহ্‌র অপার কুদরত একজন মহান ব্যক্তির দেহে রূপায়িত হইবেই হইবে।'

ইকবাল তাসাউফ শাস্ত্রের যে 'কামিল ইনসান'-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা শায়খ্ মুহীউদ্দীন বিন্ আরবী এবং ইবরাহীম আলজেয়লীর পরিকল্পিত 'কামিল ইনসান'। অবশ্য একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইবরাহীম জেয়লীর 'কামিল ইনসান' ও ইকবালের 'নায়েবে হক'-এর মধ্যে বহু পার্থক্য রহিয়াছে। পাঠক তাহার বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ইকবালের 'ফালসাফায়ে আজম' (فلسفہ عجم) এবং ডাঃ নিকল্‌সনের Studies in Islamic Mysticism গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবেন।

আমরা অতি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে ইকবালের 'কামিল ইনসান' ও আদর্শ সমাজের পরিচয় পেশ করিলাম। ইকবাল তাহার সকল গ্রন্থেই এই আদর্শ সমাজ সম্পর্কে উচ্চ আশা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস প্রচার করিয়াছেন এবং শুধু কল্পনা ও দর্শনক্ষেত্রেই নহে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনেও তিনি এমন সব মতবাদ ও চিন্তাধারার পূর্ণ বিরোধিতা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এই মহান উদ্দেশ্যের সামান্য মাত্রও ক্ষতিসাধন করিতে পারে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ইকবাল তাঁহার এই জিন্দাহ্ সমাজের সাফল্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন এবং তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, এই 'মাটির ঢেলা' অথচ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ একদিন না একদিন সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়া ফেরেশতাদের স্তর অতিক্রম করিয়া উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর লোকে আরোহণ করিতে পারিবে।

فروغ خاکیاں ازنوریاں افزوں شود روزے
زمیں ازکو کب تقدیر ماگر دوں شود روزے

একদিন মাটির মানুষ উত্থান লাভ করবে
ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে
আমাদের ভাগ্য-নক্ষত্রের প্রভাবে
জমিন পরিণত হবে আসমানে।

ইকবালের পয়গাম রাজনৈতিক, না আধ্যাত্মিক

বিশ্ব মানবের প্রতি ইকবালের পয়গাম রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, সে সম্পর্কে উপরের দীর্ঘ আলোচনা হইতে পাঠকদের সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে আশা করি। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন কোন মহলে খানিকটা বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া আমরা এই বিষয়ে এইখানে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

ইকবালের পয়গাম শুধু রাজনৈতিক ভাবাপন্ন, না উহার বুনিয়াদ আধ্যাত্মিক নীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ "ইকবালের সমগ্র বাণীই একটা আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন, এমনকি তাঁহার দার্শনিক কবিতা ও গজলগুলিও রাজনৈতিক ভাবধারায় উচ্ছ্বসিত। মিঃ ডিকেন্সের কথায় ইকবালের বাণী হিংসা উদ্দীপক— যাহাতে ধ্বংস, উচ্ছৃংখলতা ও রক্তপাতের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।"

আমাদের কথা এই যে, ইকবালের কাব্য সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সাম্রাজ্যবাদী ও রক্ষণশীল ইউরোপ প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে যখনই কোন নূতন ও নবচেতনার সামান্য স্ফুরণও দেখিতে পাইয়াছে তখনি তাহাদের দেহ মনে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মন ভীত ও শংকিত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রাচ্য দেশের উপর তাহারা অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাইয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার অগ্নিবিপ্লব জাগিয়া উঠিবার ভয়ে তাহারা আতংকিত হইয়াছে। প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুরু সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী যখন প্রাচ্য জাতিকে সংঘবদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তখন ইউরোপ উহাকেও একটা ভয়ানক প্রতিহিংসামূলক আন্দোলন মনে করিয়াছিল এবং কল্পিত বিপদের খেয়ালী চিত্র অংকিত করিয়া বিশ্ব মানবের নিকট ইহাকে কলংকিত ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার হীন প্রচেষ্টা চালাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। পাশ্চাত্য জাতি এই সব করিয়াছিল নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ ও রক্ষণশীলতার যে দুশ্ছেদ্য নিগড় দ্বারা প্রাচ্য মানবকুলকে নির্মমভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, উহাকে আরো তীব্র ও

দীর্ঘস্থায়ী করিবার মতলবে। এইজন্যই নিকল্‌সন, ফরেস্টার, ডিকেন্সন প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষী ইকবালের শিক্ষা ও চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রাচ্য দেশ হইতে এমন এক বিপ্লবী বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন, যাহার ভিত্তি মানব প্রকৃতির নিগূঢ়তম ও সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর স্থাপিত। যাহার প্রভাবে প্রাচ্য জাতি নিশ্চিতরূপে এমন এক নবজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সন্ধান পাইতে পারে, যাহা নিঃসন্দেহে সকল অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে এক দুর্দমনীয় ও সুদূঢ়প্রসারী বিপ্লব সৃষ্টি করিতে সক্ষম, যাহার ফলে সমগ্র পৃথিবীর উপর সর্বধ্বংসী কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডবনৃত্য শুরু হইয়া যাইতে পারে। এইজন্যেই ইকবালের পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তাঁহার পয়গামকে "আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক পয়গাম" বলিয়া অভিহিত করিবার দুঃসাহসিক স্পর্ধা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে ইকবাল নিজেই একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন ঃ

এই দ্বন্দ্ব-কলহ হইতে আমি রাজনৈতিক নয়— কেবল নৈতিক অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকি। অথচ নিট্‌শের সম্মুখে রহিয়াছে ইহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

এতদ্ব্যতীত 'পয়ামে মাশরিক' কাব্যের ভূমিকায় এই নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি বলিষ্ঠতর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

প্রাচ্যের জাতিরই এই কথা জানিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক যে, সর্বপ্রথম ব্যক্তিজীবনের গভীর অভ্যন্তরে কোন প্রকার বাস্তব বিপ্লব সৃষ্টি না হইলে সামাজিক জীবনের নিজস্ব পরিবেশে কোনরূপে 'বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন' সূচিত হওয়া সম্ভব নয়। কোন নূতন জগত বাহ্যিকরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব প্রথমে সকল মানুষের মনের গোপন কোণে দানা বাঁধিয়া না উঠিবে। প্রকৃতির এই অটল নিয়মকে কুরআন মজীদে সহজ ও গভীর ভাষায় বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার একবিন্দু পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তাহারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হয়।

ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি— উভয় জীবন সম্পর্কেই সত্য এবং আমি আমার ফার্সী গ্রন্থাবলীতে এই সত্যই প্রমাণ করিবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি।

ইকবাল এখানে যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দিকে ইশারা করিয়াছেন, তাহার অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিপ্লব— যাহা জাতির মূল অনুভূতিকেই পরিবর্তিত করিয়া দেয়— তাহার হৃদয়দেশকে এমন একটা নিগূঢ় ও গভীর চেতনায় পরিপূর্ণ করিয়া দেয় যেখান হইতে 'খুদী' বা 'অহমে'র চিত্তহারী সুরঝংকার স্বতঃই ধ্বনিয়া উঠে। এই ধরনের বিপ্লবকে সক্রিয়ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে শ্রান্তিহীন সংগ্রাম আবশ্যক। এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা নিবেদন করিব যে, ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত তীব্র বিরোধিতা এই কারণে করিয়াছেন যে, তাহাতে বুদ্ধি এবং বস্তুবাদ আদর্শগত ও মৌলিকতার মর্যাদা দখল করিয়া রহিয়াছে; পক্ষান্তরে ইকবাল তাঁহার সমস্ত কাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন 'বিনয়' ও 'প্রেম'-এর উপর। উপরন্তু, এই একটি জিনিসকেই তিনি নিখিল জড়জগতের প্রকৃত উন্নতি ও সুস্থতার মৌলিক কারণ বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইকবালের অভিযোগ এই যে, উহার সমগ্র শাখা-প্রশাখাই এই বুদ্ধিবাদ ও জড়বাদের (Materialism) মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ও জর্জরিত। ইহারই কারণে ইউরোপীয় সভ্যতার গোটা দেহসত্তা প্রতিনিয়ত দুর্বল, পঙ্গু এবং জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রাচ্য জাতি যখনি আত্মজ্ঞান হারাইয়া 'খোদফরামুশী'র (আত্মভোলা) গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, তখনি ইকবালের দরদী অন্তর নিদারুণ ব্যথায় ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মর্মবীনায় বেদনার হৃদয় বিদারী সুর ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুঃসহ আঘাতে তাঁহার দুই চক্ষু কোটর হইতে সমগ্র ধারায় বহিয়া নামিয়াছে তপ্তগলিত অশ্রুর বন্যা। এই নিরাকার বেদনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার 'পয়ামে মাশ্‌রিক, 'বাংগেদারা' 'জাবীদনামা,' জবুরে আজম' ও 'আরমগানে হিজাজ' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে। উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার বেদনার্ত সুর ঝংকার— সারা দুনিয়াকে করিয়া তুলিয়াছে ব্যাকুল চঞ্চল। এই সব গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, কবিতার প্রত্যেকটি পংক্তিতে, শব্দের প্রতিটি ধ্বনিতে আমরা দেখিতে পাই পাশ্চাত্যের স্থুল বস্তুবাদ ও দেহকেন্দ্রিক দর্শন বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ইকবালের হৃদয় মন জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর উপর ইউরোপের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও ইকবালের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছে ইউরোপের আত্মিক ব্যাধি এবং উহার সভ্যতায়

ধর্ম ও চরিত্রের প্রভাবহীনতা দর্শনে। আর সকল প্রকৃতির প্রাচ্য জাতিও সঙ্গে সঙ্গে এবং উহারই অনুকরণে সেই সব মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি আরো অধিক বেদনা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোটকথা, ইকবালের পয়গামের উদ্দেশ্য দুইটি ঃ প্রথম প্রাচ্যদেশ ও জাতিকে পাশ্চাত্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি হইতে রক্ষা করা আর দ্বিতীয় খোদ ইউরোপকেও উহার এই মারাত্মক রোগের কথা জানাইয়া সতর্ক ও সাবধান করিয়া দেওয়া। উপরে আলোচিত সমস্ত কথাই 'পয়ামে মাশরিক' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহারই দুইটি পংক্তি ঃ

عجب آں نیست کہ اعجاز مسیحا داری
عجب ایں است کہ بیمار تو بیمارتراست
دانش اندو ختہ دل زکف انداختۂ
آہ ازاں نقد گراں مایہ کہ درباختہ

বিস্ময়কর নয় তোমার হাতে আছে
মসীহ্‌র অপূর্ব চিকিৎসা শক্তি
বরং তোমার রোগী হচ্ছে ক্রমাগত রুগ্নতর
এটাই হচ্ছে বিস্ময়কর।
বুদ্ধি অর্জন করেছ বটে
দিলকে করেছ উপেক্ষা;
আফসোস, এই উপেক্ষিত সম্পদই ছিল
অধিক মূল্যবান।

জবুরে আজম' গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

برعقل فلك پيما تر كانه شبخوں به
يك ذره درد دل ازعلم افلاطوں به

তুর্কী জাতির আকাশচারী জ্ঞানের চেয়ে
শ্রেষ্ঠ নৈশ আক্রমণ,
বিন্দুমাত্র সমবেদনা শ্রেষ্ঠ
আফলাতুনের জ্ঞানের চেয়ে।

'বালে জিবরী:ল' তিনি বলেন ঃ

برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھا سے
فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری

দোষ ধরো না, পরীক্ষা করে দেখো—
পশ্চিমী মনের ধ্বংসের উপর
কায়েম হবে সত্যিকার জ্ঞান।

এই কবিতাগুলি এবং এই ধরনের আরো অনেক কবিতা এই নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূল ভাবধারার প্রতি ইকবালের আন্তরিক ঘৃণা বিদ্যমান ছিল। এই ঘৃণা লেনিন, এইচ. জি. ওয়েলস, বার্নার্ড শ' ও সিংলারের ঘৃণাবিদ্বেষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। কারণ ইহারা প্রকৃত রোগ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করিতে পারিলেও উহার প্রতিষেধক আজিও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই, যেমন করিতে পারিয়াছেন আমাদের দার্শনিক কবি ইকবাল।

ইকবালের একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাপদ্ধতি বিদ্যমান, তাহা ইউরোপের সর্ববিধ ব্যাধির পক্ষে এক 'অব্যর্থ মহৌষধ' রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু দাম্ভিক পাশ্চাত্য জাতির কর্ণকুহরে ইকবালের মর্মবিদারী আওয়াজ কোনদিনই প্রবেশ করিতে পারিবে কি ?

উপসংহার

উপরের দীর্ঘ আলোচনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইকবাল তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্যে বিশেষ কোন বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্টভাবে আকড়িয়া ধরিয়া থাকেন নাই। কেননা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানব সমাজে একটা নবজাগরণ সৃষ্টি করা। তিনি মতবাদ ও আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করিয়াছেন ইসলামকে, তাহাই ছিল তাঁহার পরিণত চিন্তাধারা ও আকীদা বিশ্বাসের মূল উৎস। তিনি 'খুদী'র উন্মেষ ও বলিষ্ঠতা বিধানের সাহায্যে প্রাচ্য দেশে এক নূতন জীবনের উদ্দাম প্রেরণ জাগাইয়া তুলিবার সংকল্পনা করিয়াছেন। এই জন্যেই তিনি মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কেই সংক্ষেপে কিংবা বিশদরূপে আলোচনা পেশ করিয়াছেন। বর্তমান ক্ষুদ্র রচনা তাঁহার বিরাট সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত সেই আলোচনা সমূহেরই আংশিক সমষ্টিমাত্র। তাঁহার এবম্বিধ আলোচনা ও মতবাদ চিন্তাধারাকে খুদী, বিনয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তীব্র ঘৃণা— ইকবাল সাহিত্যের এই মৌলিক উপাদান ও বিষয়বস্তু হইতে মোটেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যাইতে পারে না। এইসব মৌলিক উপাদান ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই ইকবালের বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার রচিত হইয়াছে। রাজনৈতিক আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই তাহার সাহিত্যের অসংখ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু ইকবাল যে তথাকথিত রাজনীতি চর্চাকারীদের ন্যায় কোন রাজনীতিক ছিলেন না, তাহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, তিনি জাতিকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বদানে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না বা তাহা হইতে পশ্চাদপদ থাকিতেন না। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

هزار شکر نہیں ہے دماغ فتنۂ تراش
هزارشکر طبعیت ہے ریزہ کار میری
هوائے بزم سلاطیں دلیل مردہ دلی
کیاهے حافظ رنگیں نوائے رازیہ فاش

হাজার শোকর,
উচ্ছৃংখল নয় আমার মস্তিষ্ক,
স্বভাব আমার ভেঙে গড়া,
শাহী দরবারে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা—
সে তো মৃত মনেরই পরিচয়।
হাফিযের মধুক্ষরা কণ্ঠে
প্রকাশ লাভ করেছে এ রহস্য।

বস্তুত বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের জাতীয় ও তমদ্দুনিক আন্দোলনের সাথে আল্লামা ইকবালের গভীর সম্পর্ক ও কার্যকরী যোগাযোগ বর্তমান ছিল। তদানীন্তন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব আল্লামা ইকবালেরই রাজনৈতিক চিন্তা-গবেষণা ও কল্পনার ফল, তাহা কাহার না জানা আছে। পাক-ভারত-বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন সমূহের উপর ইকবালের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই রুশো ও ভল্টেয়ারের সাহিত্য ফ্রান্সে যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে, এশিয়া কিংবা পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইকবালের সাহিত্যও যে একদিন অনুরূপ এক ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, তাহতে ইকবাল সাহিত্যে অভিজ্ঞ কাহারও একবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না।

IQBAL AC... PAKISTAN
Library
45324
LAHORE

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সূদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কল[illegible] তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয়[illegible]

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪[illegible] দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে [illegible]

8U
00045324

খায়রুন প্রকাশনী